অষ্টম অধ্যায়

দুই উপত্যকার কবিদের তুলনামূলক আলোচনা

এই অধ্যায়ে আমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিদের রূপক, চিত্রকল্প, আঙ্গিক, ভাষা, বোধের সঙ্গে তুলনামূলক একটি আলোচনা করব বরাক উপত্যকার কবিদের। প্রায় একই সময়ে কবিতা লিখেছেন বরাক উপত্যকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস[১] ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অমলেন্দু গুহ[২]। অথচ তাঁদের প্রায় মিলই নেই। আবার অমিতাভ দেবচৌধুরী[৪] ও বিকাশ সরকারের[৪] ক্ষেত্রেও কোনো সমতা বা মিল চোখে পড়ে না। অথচ কবিদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর যে বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে তা প্রায় একই। আর সেজন্যই শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর[৫] সঙ্গে উদ্‌বাস্তু চেতনা বা দেশভাগের মানসতায় এক হয়ে ওঠেন ঊর্ধ্বেন্দু দাশ[৬] বা কিশোর ভট্টাচার্য[৭]। দিলীপকান্তি লস্কর[৮] যেমন করে লেখেন তারই অন্য ধাঁচটা যেন সঞ্জয় চক্রবর্তীর[৯] কবিতায় আবছাভাবে ফুটে ওঠে।

১৯শে মে বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যতদিন বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতি পৃথিবীর বুকে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে— ততদিন পর্যন্ত ১৯শে মে অমলিন গৌরবে এক আলোকবিন্দু হিসেবেই দিক নির্দেশ করে যাবে।

১৯শে মে, ১৯৬১ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে, শিলচর রেল স্টেশনে এগারো জন তরুণ-তরুণী বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ-রকম ঘটনা এর আগে আর কখনও ঘটেনি। বিশ্বের ইতিহাসেও তা বিরল।

(১)

ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উজ্জীবিত একদল মানুষ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে নিলেন আমাদের প্রতিবেশী ভূখণ্ডে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১, মাত্র উনিশ বছরের ব্যবধানে। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এ ঘটনা শুধু ঐতিহাসিকই নয়, যুগান্তকারী। পৃথিবীর সভ্য মানুষের ইতিহাসেও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের এ-ধরনের উজ্জ্বল সাফল্য নজিরবিহীন।

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় ঘটেছে—যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। পাকিস্তানের কুক্ষিগত পূর্ববাংলার সংগ্রামী ছাত্র ও জনতা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা

প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। খুবই গৌরবের বিষয়, সেই ২১ ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছরই তা পালিত হবে— রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য প্রতিটি দেশে।

বাহান্ন থেকে মাত্র নয় বছর পর, ১৯৬১ সালে, তদানীন্তন, বর্তমান বরাক উপত্যকায় ভাষার দাবি জানাতে গিয়ে, নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে এগারোটি তাজা প্রাণ বলি দিতে হয়েছিল এই শিলচরে। অনেকেই পঙ্গু হয়েছেন। কিছু কিছু পরিবারে দুর্দৈব নেমে এসেছে, অপরিমেয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু ফলশ্রুতি? ইতিহাসের প্রয়োজনেই তার পর্যালোচনা জরুরি।

যে-সমস্ত দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল— তা আজও অপূর্ণ। এই অপ্রিয় সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আন্দোলনের ব্যর্থতার সবচেয়ে দুঃখজনক দিকটি হল, আজ পঞ্চাশ বছর পরও শহিদদের সরকারি স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত মেলেনি, গুলিবর্ষণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্ট আজও হিমঘরে। বিধানসভায় এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে রিপোর্টটিই নাকি এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চক্ষুলজ্জাহীন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কেউ কারও কাছে জবাবদিহি করার প্রয়োজন বোধ করেন, একটি রাষ্ট্র নাগরিকদের হত্যা করেও যখন বিচারের ঊর্ধ্বে থেকে যায় তখন কি তাকে সভ্য রাষ্ট্র বলা সংগত?

(২)

অসমে ভাষা-বিরোধ দীর্ঘদিনের। বলা যায় তা ইংরেজ সৃষ্ট। ব্রিটিশরা আসামকে ইংরেজ-অধিকারে নিয়ে আসার পর যখন দেখল এখান থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব দ্বারা প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ সম্ভব নয়, তখন তারা বাংলাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেয়। ফলে নবগঠিত রাজ্যের প্রশাসন, ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিল্প—সব ক্ষেত্রেই বাঙালিদের ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ ঘটে। এ-ছাড়া নব প্রতিষ্ঠিত চা-শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, জাহাজ বা রেল পরিবহণ সম্প্রসারণের প্রয়োজনেও বাঙালিদের ব্যাপক প্রব্রজন ঘটে এই রাজ্যে। তথাকথিত ভূমিপুত্রদের দিয়ে সমস্ত চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। এমন কি কৃষিকাজের জন্যও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের নানাভাবে প্রলোভিত করে নিয়ে আসা হয়।

অসমিয়া ভাষার প্রসার, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই বাঙালিদের অবদান রয়েছে। কিন্তু সদ্য উদ্ভূত অসমিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাঙালিদের প্রতিপক্ষ এমন-কি শত্রু ভাবতে শুরু করে। এর পেছনে খ্রিস্টান মিশনারিদেরও ইন্ধন ছিল, ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জোড়হাট সার্বজনিক সভা সরকারি চাকরিতে ভূমিপুত্রদের অগ্রাধিকার এবং সংখ্যাধিক্য দাবি করে, ১৯১৭ সালে অসম সাহিত্য সভা এবং ১৯১৯ সালে অসম ছাত্র সম্মেলন অসমের জন্য ভাষাগত আঞ্চলিক পরিচয়ের রক্ষাকবচ দাবি এবং সরকারের কাজকর্মে বাঙালিদের নিযুক্তির ব্যাপারে আপত্তি জানায়। যদিও শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া তখন অসম প্রদেশেরই অন্তর্গত এবং বাঙালিরা সংখ্যার দিক দিয়ে অসমিয়াদের চেয়ে কম নয়। এক শ্রেণির অসমিয়া বুদ্ধিজীবী তখন থেকেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জেহাদ শুরু করেন। বিভিন্ন ফোরাম থেকে যে সমস্ত দাবি তোলা হয় সেগুলির মধ্যে রয়েছে— (১) সব ধরনের নিযুক্তিতে স্থানীয়দের (অসমিয়া ভূমিপুত্র) অগ্রাধিকার, (২) অসমের জমি বহিরাগতদের থেকে দখলমুক্ত করা, (৩) বাংলাভাষী জেলাগুলিকে বঙ্গদেশের সঙ্গে

যুক্ত করা।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, বাধ্যবাধকতা বা অবিমৃশ্যকারিতা যাই বলা হোক-না কেন, তদানীন্তন জাতীয় নেতৃত্ব উগ্র অসমিয়া জাত্যাভিমানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে, গণভোটের মাধ্যমে শ্রীহট্ট জেলাকে পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হয়। বিরাট সংখ্যক বাঙালি ও অন্যান্য ভাষাভাষী অধ্যুষিত অসমকে একমাত্র অসমিয়াভাষী রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মূল প্রতিবন্ধক অপসারিত হল বলেই তদানীন্তন অসমিয়া নেতৃবৃন্দ ধরে নিলেন। শ্রীহট্ট বিদায় সন্দেহাতীতভাবেই উগ্র অসমিয়া জাত্যাভিমানের এক বিরাট সাফল্য।

(৩)

বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংহতি ও সৌহার্দ্যের কথা ভেবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিশের দশকেই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক অঞ্চল Economic হিসেবে প্রদেশে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নিল। বলা বাহুল্য এর মধ্যেই নিহিত হল অনৈক্যের বীজ।

'দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরই অসমের প্রথম প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) গোপীনাথ বরদলৈ[১০] গোলাঘাটে এক ছাত্র সম্মেলনে ঘোষণা করলেন—It is not the intention of the Government to make Assam a bilingual state. For the homogeneity of the province, they (i.e., Assamese) should adopt the Assamese language.....Assam is far Assamese এই দর্শনই ফুটে উঠল স্বাধীনতা-উত্তর অসম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে, রাজ্যপালের ভাষণে The native of Assam are now masters of their own house. They have a Government which is both responsible and responsive to them. They can take what steps are necessary far encouragement and propagation of Assamese language and culture and the languages and customs of tribal people, who are their fellow citizens and who also must have a share in the formation of such policies

I would therefore appeal to you to exert all the influence you posses to give the stranger in our midst a fair deal, provided of course, he in his turn deals loyally with us. কল্পনা করা যায়, স্বাধীন দেশে একটি প্রদেশের রাজ্যপাল, ওই প্রদেশে বসবাসকারী কোনও ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করতে পারেন, গণতন্ত্রের পবিত্রতম আসন আইনসভায় দাঁড়িয়ে!'

(উনিশের কবিতা, পৃ. ১৩)

১৯৪৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, যেদিন রাজ্যপাল এই ভাষণ পাঠ করছেন, সেদিন কিন্তু গোয়ালপাড়া জেলার অসমিয়াকরণ সম্পন্ন হয়নি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যান্য জেলায়ও বংশানুক্রমিকভাবে বসবাসকারী বাঙালিরা নিজেদের ভাষিক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন, অবিভক্ত কাছাড়ের বাঙালি জনসংখ্যা মিলিয়ে রাজ্যে বাঙালির অনুপাত তখন আধাআধি-না হলেও চল্লিশ শতাংশের তো বেশিই ছিল। অসম সরকার তথা অসমিয়া উগ্রজাত্যভিমানীরা কিন্তু কোনও রকম বিচার বিবেচনা ছাড়াই ভাষিক একাধিপত্য স্থাপনে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন।

(৪)

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্য গঠিত কমিশনের সুপারিশ ছিল কোনও প্রদেশে একক ভাষাগোষ্ঠীর অনুপতি সত্তর শতাংশ না-হলে সেটিকে এক ভাষাভাষী প্রদেশ বা ইউনিলিঙ্গুয়াল স্টেট করা যাবে না।

১৯৫১ সালের জনগণনার রিপোর্টকে নানাভাবে প্রভাবিত করেও অসমিয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা পঞ্চান্ন শতাংশের বেশি দেখানো যায়নি। ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে অসমের অসমিয়াভাষীদের বৃদ্ধির হার এত ব্যাপক এবং অস্বাভাবিক ছিল যে সেনসাস কমিশনার ডাগাইওয়ালা মন্তব্য করেছিলেন, এটি একটি (Biological) ওই সেনসাস অনুযায়ী ১৯৩১ থেকে ১৯৫১ বিশ বছরে অসমিয়া জনসংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে হয় ৪৮ লক্ষ আর বাঙালি জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ থেকে কমে ১৭ লক্ষে।

গণভোটে সিলেট পাকিস্তানে চলে যাওয়া সত্ত্বেও বাঙালিদের এই সংখ্যা কোনও হিসেবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও অসমিয়াকে একক রাজ্য ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার উপাত্ত যখন সংগৃহীত হল না— একদিকে আরম্ভ হল বাংলাভাষীদের উপর জোর— জুলুম, অত্যাচার, দাঙ্গা অন্যদিকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ২৪ অক্টোবর, ১৯৬০ বিধানসভায় রাজ্যভাষা আইন পাশ করানো হল। অথচ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুরাম মেধি[১১] স্বয়ং State Reorganisation Commission-এর কাছে স্বীকার করেছিলেন অসম একটি বহুভাষিক রাজ্য। Assam disturbance নিয়ে যখন সংসদে আলোচনা হয় তখন ডা. হৃদয়নাথ কুঞ্জরু,[১২] যিনি এসআরসি-র অন্যতম সদস্যও ছিলেন, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে Assam is a multingual state. বিধানসভায় কাছাড়ের প্রতিনিধিরা একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণায় আপত্তি করলেন। অনেকে পদত্যাগও করলেন। সারা রাজ্য জুড়েই বাংলাভাষীরা এই ভাষা আইনের প্রতিবাদ জানালেন। বিধানসভায় গৃহীত ভাষা আইনের প্রয়োগ প্রতিবোধ করার জন্য কাছাড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেওয়া হল। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন তার চরম শীর্ষে পৌঁছল— যেদিন শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে এগারোজন তরুণ-তরুণী পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দিলেন।

(৫)

কিন্তু তাঁদের আত্মবলিদান সার্থক হল না। সারা অসমের বাঙালি তথা ভাষিক সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম দিল, রাজনৈতিক কাপালিকদের চক্রান্তে তা আপসের চোরাবালিতে বিপথগামী হল। কাছাড়ের জেলা স্তরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির তথাকথিত শাস্ত্রী-ফর্মুলা আজও শুধু কাগুজে সিদ্ধান্তমাত্র। কার্যে রূপায়িত হয়নি। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় যেখানে বাঙালি জাতিসত্তার লৌহদৃঢ় ঐক্যের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, এখানে দেখা গেল বিপরীত স্রোত। স্বার্থান্ধ নেতৃত্বের অঙ্গুলি হেলনে কাছাড়ের বাংলাভাষীদের একাংশ বাংলা ভাষায়ই স্লোগান দিয়েছিল— 'আমাদের ভাষা অসমিয়া ভাষা', 'বাংলা ভাষা চাই না, চাই না।' একষট্টির ভাষা আন্দোলনে কংগ্রেস কমিউনিস্ট উভয় দলই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বিশেষ প্রতাপশালী কংগ্রেসি মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর মদতে গড়ে উঠেছিল আন্দোলন—বিরোধী শান্তি পরিষদ। কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যায়িত করে কর্মীদের এ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক ফণী বরা বিবৃতি দিলেন— 'কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদের এই আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। অসমকে বহুভাষী রাজ্য করার যে কার্যসূচি এই আন্দোলনে গৃহীত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি তা সমর্থন করে না।' ইতিহাসের জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা যে শুধু একষট্টি সালেই আমাদের প্রত্যক্ষ করতে

হয়েছিল তাই নয়, আজও অসমিয়া সম্প্রসারণবাদের পদলেহীরা প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে বরাকের ভাষা বাংলা নয়, বরাকী। বরাকের অফিস-আদালতে অসমিয়া ভাষায় মুদ্রিত ফর্ম-কাগজপত্র এলেও দোষের কিছু খুঁজে পান না। সেই সব নেতার কৃপাধন্য হওয়ার জন্য তথাকথিত ভাষাদরদি, সংগ্রামী নেতাদের হুটোপুটি-উনিশের উত্তরাধিকার গর্বিত প্রজন্মকে কোন পথনির্দেশ করে— তার ইঙ্গিত এখন ও ভবিষ্যতের গর্ভে।

(৬)

বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন নিয়ে পূর্ব বাংলায় যে-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। কবিতা, গান, নাটক গল্প-উপন্যাস যেমন লেখা হয়েছে তেমনি আন্দোলনের আনুপূর্বিক বিবরণ ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ পূর্ব বাংলার সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। সব অগ্রণী সাহিত্যকর্মীই এতে অংশ নিয়েছেন।

উনিশের ঘটনা এপারের বাঙালি মননে তাৎক্ষণিক একটা নাড়া দিলেও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠেনি। মনীশ ঘটক,[১৩] বনফুল,[১৪] দক্ষিণারঞ্জন বসু[১৫] প্রমুখ কবিতা লিখেছেন শহিদদের স্মরণে, মনোজ বসুর গদ্যেও তার স্বীকৃতি রয়েছে, আন্দোলনের প্রতিবেদনমূলক বই সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীর[১৬] 'মুখের ভাষা বুকের রুধির'ই একমাত্র বহুল প্রচারিত সাহিত্যকর্ম।

শিলচরের শিল্পী-গায়করা শহিদদের নিয়ে গান বেঁধেছেন, মিছিলে সমাবেশে তা গাওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত কবি লেখকদের তাৎক্ষণিকভাবে তেমন এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি, ঘটনার বহু বছর পর ১৯শে মে নিয়ে যখন নতুন প্রজন্মের মধ্যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল, প্রয়াস চলল স্মারক সংকলন ইত্যাদি প্রকাশের, তখনই যেন কেউ কেউ চাহিদা পূরণের জন্যে কলম ধরতে বাধ্য হলেন। কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য[১৭] ও অনুরূপা বিশ্বাস[১৮] দুটি সংকলন প্রকাশ করলেন উনিশের স্মরণে। উনিশে মে-কে কেন্দ্র করে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম অশোক বার্মার[১৯] উপন্যাস 'ভোরের সানাই' যা 'বরাক'-এর একটি শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, এখনও গ্রন্থ হিসেবে মুদ্রিত হয়নি। গুটিকয়েক গল্প লিখেছেন নতুন প্রজন্মের গল্পকাররা।

কবিতা অনেকেই লিখেছেন এবং লিখছেনও। উনিশের ইতিহাস নিয়ে বই লিখেছেন বিপ্ররাজ দাস,[২০] সুবীর কর,[২১] সনৎকুমার কৈরী,[২২] পরিতোষ পাল,[২৩] কানু আইচ,[২৪] ইমাদউদ্দিন বুলবুল[২৫] প্রমুখ। গত ক'বছর ধরে কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন এবং সংকলনও প্রকাশ হচ্ছে উনিশকে কেন্দ্র করে।

উনিশকে নিয়ে বৃহৎ এবং ব্যাপক অর্থে কাজ করেছেন দিলীপকান্তি লস্কর। অপরিমেয় পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে 'লালন মঞ্চ'-এর দুটি বৃহৎ সংকলন প্রকাশ এক উল্লেখযোগ্য অবদান। পরবর্তী সময়ে লালন মঞ্চ-এ প্রকাশিত রচনাগুলোকে পৃথক পৃথক পুস্তক হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

১৯শে মে-র পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে অসমের অগ্রগণ্য বাংলা প্রকাশন সংস্থা ভিকি পাবলিশর্স একটি কবিতা-সংকলন উদ্যোগ নিয়েছেন। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সংকলনটি তৈরি করতে গিয়ে অনেক অপূর্ণতা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। ১৯শে মে-র শহিদদের নিয়ে যাঁরাই ভাবনা-চিন্তা করেছেন তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত করতে চাওয়া হয়েছে এই সংকলনে। কিন্তু যোগাযোগ করা সত্ত্বেও সময়মতো রচনা এসে পৌঁছয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বে মুদ্রিত রচনা অন্তর্ভূক্ত করতে হয়েছে। প্রয়াতদের ক্ষেত্রে তো এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

রচনা সংগ্রহে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে সুবীর কর, জন্মজিৎ রায়,[২৬] দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য ও অশোক বার্মার নাম অবশ্যই উল্লেখ্য। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা লালন মঞ্চ-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

দুই উপত্যকার কবিদের মধ্যে ভাষা আন্দোলন ও অসম আন্দোলনের প্রভাব

এবার আমরা কবিতায় মূল আলোচনায় ঢুকছি।

ছবি গুপ্তা[২৭] লিখেছেন 'উনিশে মে' কবিতায় লিখেছেন যে সেইসময়ের ভাষা আন্দোলনে বরাকের যে রক্তাক্ত যৌবনের প্রতি তাঁর মনোকষ্ট তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না। তাই তিনি লিখেছেন এভাবে—

'উনিশ মে, বলো কোথা রাখি
তোমার সাঁইত্রিশ বছরের রক্তাক্ত যৌবন?'

(১৯-এর কবিতা ও গান, পৃ. ২১)

কবি বলছেন শিরদাঁড়া সোজা করলে হিমালয় দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে চাই এ যুবকদের। আবার মাথা নিচু করলে সাগর কোলে নিতে চায়। অর্থাৎ প্রকৃতিও এই উনিশে 'মে'-তে ক্ষয়িত এই যৌবনকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চায়। তারপরেই কবি সে কালবৈশাখীর ঝড়ে বিপর্যস্ত ভাঙচুর অনুভূতির কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

শিরদাঁড়া খাড়া করলে হিমালয় দুহাত বাড়ায়
মাথা নীচু করলে সাগর কোল পেতে দেয়।
অথচ কালবৈশাখী ঝড়ে ভাঙ্গচুর অনুভূতি
বিপর্যস্ত পথের মোড়ে রবীন্দ্রনাথ।

—'বিপর্যস্ত পথের মোড়ে রবীন্দ্রনাথ' বলতে— কবি বোঝাতে চেয়েছেন বাংলা ভাষার বিপন্নতা।

তারপরেই কবির প্রশ্ন 'কোথা রাখি? কোথা রাখি?' কারণ চতুর্দিকে জননীর বুকফাটা কান্না। বস্তুত কবি উনিশে 'মে'-তে যে এগারোজনের রক্তাক্ত যৌবন শেষ হয়ে গেল তা-ই এই কবিতায় ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

আবার সঞ্জয় চক্রবর্তী এই '১৯শে মে' কবিতায় লিখেছেন যে তারাপুর রেল স্টেশনে পুলিশ যেভাবে আন্দোলনকারীদের উপরে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছেন এবং এগারোজন যুবক-যুবতী প্রাণ হারিয়েছিলেন তার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন কবির বাবা।

বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে আন্দোলন সে সময়ে হয়েছিল তার রেশ কবির বাবা রেখে গেছেন কবির ঠোঁটে, মাতৃভাষাকে ভালোবাসার সেই দুরন্ত গল্প। এর ব্যাখ্যা কবি দিচ্ছেন এভাবে

'আমি সেই পক্ষী,
যার ঠোঁটে বাবা,
রেখে গিয়েছেন

মাতৃভাষাকে ভালোবাসার

এক দুরন্ত গল্প

শাবকেরা গল্পহীন'

(তদেব, পৃ. ৭৬)

— 'শাবকেরা গল্পহীন' বলতে সম্ভবত কবি বলতে চেয়েছেন তার পরবর্তী প্রজন্মের কথা। যে প্রজন্ম বাংলা ভাষার মর্ম প্রায় বোঝে না বললে চলে।

আবার শক্তিপদ ব্রহ্মচারী 'উনিশে মে ১৯৬১ শিলচর' কবিতায় লিখেছেন দশ যুবক ও এক যুবতীর এই ভাষা আন্দোলনে প্রাণ হারানোর হৃদয় বিদারক কাহিনি।

'দশটি ভাই চম্পা আর একটি পারুল বোন

কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল, এই যে ঈশান কোণ—

কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শোন।'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৬৪)

এই কবিতার মধ্যে কবি শক্তিপদ 'উনিশে মে'র এগারোটি সতেজ প্রাণের বলিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে গুয়াহাটিতে বসে দেবাশিস ভট্টাচার্য[২৮] লিখছেন 'একাদশ শহিদ সমীপেষু'। তাঁর বক্তব্য এই যে হয়তো তাঁর লেখা কবিতা কেউ কোনোদিন পড়বেন না। কেউ কোনোদিন হয়তো শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানগুলোও দেখতে যাবে না। কবি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী না, তাই স্বপ্ন ছাড়া কারো সঙ্গে তাঁর দেখাও হবে না। কবি বলছেন স্বপ্নের এই নিরন্তর আশা নিয়ে তিনি কিছু আয়োজনও করতে পারেন। কিন্তু এ স্বপ্নে যাঁরা আসবেন সে এগারোজন লোককে তো কোনোদিন দেখেননি, এমন কি কোনোদিন তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেননি। এমনকি কোনোদিন চায়ের টেবিলে বসে আড্ডাও দেননি।

তবুও মাঝরাতে একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেছেন অনেকগুলি মুখের। যাঁদের মুখগুলি কালো ছায়ার মতো একইরকম একটুও তফাত নেই কোথাও। এবারে কবি সেই পৌঁছেছেন কবিতার সেই climax-এ। সেখানে ওই এগারোজন শহিদের নাম ফুটে উঠেছে।

...সবার পরস্পরের নাম ধরে ডাকাডাকি করছিল; রফিক, দিব্যেন্দু, কমলা, সুনীল কিম্বা বেঞ্জামিন। নামগুলো শুনে শুনে মাথা নুয়ে গেল শ্রদ্ধায়। প্রণাম করতে গেলাম, মালা দিতে গেলাম ; আপনারা দূরে সরে গেলেন। বলে উঠলেন "প্রণাম দিয়ে কর্তব্য সেরে ফেলতে চাও? গলায় মালা দিয়ে দেয়ালের ছবি করে রেখে দিতে চাও? আর কিছু নয়!"

কবির এই এগারো শহিদের নাম শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল। তিনি প্রণাম করতে চাইলেন তাঁদের চাইলেন মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু একে একে সকলে সরে গেলেন এবং বলে উঠলেন প্রণাম করে কর্তব্য সেরে, গলায় মালা ঝুলিয়ে শুধু দেয়ালের ছবি করে রাখলেই কি সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গেল? আর কিছুই কি তাঁদের পাওয়ার নেই? এই যে এগারোটা সতেজ প্রাণ তাঁদের রক্ত দিয়ে বাংলা বাষাকে অমর করে রেখে গেলেন তাঁদের প্রাপ্য কি শুধু এটুকুই। প্রসঙ্গত এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের লাইন মনে পড়ে যায়—

'তুমি কি কেবলই ছবি?'

প্রকৃতার্থে কবির ঘুম ভেঙে গেল এবং কবির মতো আমাদের শিরায় উপশিরায় ধমনিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে এই একই কথা 'আর কিছু নয়।' আসলে কবি এখানে বলতে চাইছেন যে এই এগারো শহিদ শুধু ছবি হয়ে মালা পরে দেওয়ালে ঝুলে থাকার মতো নন। এঁরা প্রত্যেক বাঙালির রক্তে প্রবাহিত ফল্গুধারা।

অসমের দুটি উপত্যকায় সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাষা আন্দোলন হয়েছে। বরাক উপত্যকায় ১৯৬১ সালে ১৯ মে ভাষা রক্ষার দাবিতে মৃত্যু হয়েছিল ১১ জনের। সেটা ছিল বাংলা ভাষা রক্ষার লড়াই। আবার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমিয়াভাষীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার আরেকটি আন্দোলন শুরু হয় গত শতাব্দীর আটের দশকে গোড়ায়।

এই দুটি আন্দোলন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। অসমের বাঙালিরা বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালিরা শুধু দেশভাগের আনন্দ বা বেদনা নিয়েই বেঁচে নেই। ভাষা আন্দোলন, জাতিগত দাঙ্গার স্মৃতিও আমৃত্যু বহন করেছেন এ অঞ্চলের বাঙালিরা। স্বাভাবিক ভাবেই কবিদের কলমে উঠে এসেছে জাতিদাঙ্গা বা দেশভাগের অম্লান চিত্র। অস্বস্তি দশকওয়াড়ির হিসেবে আটের দশকের কবি কিশোর ভট্টাচার্যের[২৯] একটি কবিতা শুরুই করেছেন এভাবে—

'হুররে আজ আসাম অ্যাকর্ড' (উবুদশ, পৃ. ১৬৬)

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন পঙ্‌ক্তি লেখা যায় না।

সময়টা ষাটের দশক। কবিদের ঘিরে ছিল এক অস্থিরতা। মেধা বা মনন জীবনসত্য আঞ্চলিকতা ডিঙিয়ে তখন উড়াল পাখি বৃহত্তর বাংলা কাব্য ও সাহিত্য আকাশে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব না দিয়ে মূল স্রোতে বয়ে যাওয়ার জন্য হৃদয় ও কলম তীব্র ভাষায় কাজ করে চলেছে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঊর্ধ্বেন্দু দাসের[৩০] একটি কবিতার নামই 'সাকিন আসাম ১৯৮৩'। পড়লেই আটের দশকের ভয়াবহ ছবি ভেসে আসে। ঊর্ধ্বেন্দু লিখছেন—

'ওদিকে ভরলি আর এধারে কলঙসুঁতি, কপিলী, দিখৌ

লুইতের পার ধরে জলের উজানে যাও। জলের ভাটায় যাও।

শ্মশান। শ্মশান...

ভগ্নস্তূপের মাঝে এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে

চাপরি, লাহরিঘাট, গোড়েশ্বর, চাউল ঘোয়া, নেলি

চামগুড়ি, গহপুর মাজুলি, শিলাপাথার, নাওজান,

নিয়ামাটি, হাজো, সর্বত্র চিতা জ্বলছে ঃ এই জুই জ্বলিছে,

জ্বলিব'। (উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৮৬)

— ঊর্ধ্বেন্দুর এই কবিতাটির কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এভাবেই সন্ত্রাস

দাঙ্গার ছবি কবিতায় এঁকেছেন এই বরাক ব্রহ্মপুত্র দুই পারের দুই শক্তিমান কবি।

আবার বরাকের অন্যতম শক্তিমান কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী যেভাবে ভাষা আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন তেমনি তাঁর কলম সোচ্চার হয়ে উঠেছে অসমের 'বঙাল খেদা' আন্দোলন নিয়ে। তাঁর কবিতা 'উদ্বাস্তুর ডায়েরি'র এরই পরিচয় বহন করে।

আমরা জানি ১৯৪৭-এর পর একবার আবার ১৯৭১-এর পর দ্বিতীয়বার প্রচুর বাঙালি হয় পূর্ব পাকিস্তান নয় বাংলাদেশের ভিটে মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তুর মতো চলে এসেছিল অসমে।

যেখানে এসে তারা ভেবেছিল সেই পার্শ্ববর্তী রাজ্য নিশ্চয় তাদের আগলে ধরবে। এখানের মানুষ হয়তো তাদের ভিটেমাটির ছেড়ে আসা দুঃখকে মুছে ফেলতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অসমের বিখ্যাত কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং ভূপেন হাজরিকার[৩১] দ্বৈতকণ্ঠে এই বাস্তুভিটেহারা ধনকে আপন করে নিয়েছিল রঙমন। যার প্রকাশ এই দুই গুণী শিল্পীর কণ্ঠে ও ভাষায় অসাধারণ রূপে ফুটে উঠেছে।

ঠিক এই কণ্ঠস্বরই ফুটে উঠেছে শক্তিপদ-র কবিতায়। তিনি লিখছেন বাস্তুভিটা যারা কেড়েছে তারাই এই বাস্তুভিটে হারানোর ভয়কে কেড়ে নিয়েছে। আজ আর কবির ভুল হবে না, হিংসাজয়ী যুদ্ধে যাবেন তিনি। এরপরই এসেছে এক অসাধারণ কাব্য পঙ্‌ক্তিমালা—

'মেখলা-পরা বোন দিয়েছে একখানা তাম্বুল
এবার আমি পাঠ নিয়েছি— আর কিছুতে নয়,
ভাষাবিহীন ভালোবাসার বিশ্ববিদ্যালয়।
বাংলা আমার আই-ভাষা গো, বিশ্ব আমার ঠাঁই
প্রফুল্ল ও ভৃগু আমার খুল্লতাত ভাই!'

(তদেব, পৃ. ৬৪)

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু চেতনার অপূর্ব ছবি এঁকেছেন ড. অমলেন্দু গুহ। আমরা জানি তাঁর 'লুইত পারের গাথা'ই অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'কিন্তু বিদেশি খেদা' আন্দোলনের একটি কবিতা লালন মঞ্চ প্রকাশিত '১৯ এর কবিতা ও গান' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাটি নাম 'অ মোর অসম দেশ মরমিয়া'। কথাটির অর্থ সবার কাছেই স্পষ্ট 'ও আমার ভালোবাসার অসম দেশ'। তিনি এভাবে লিখেছেন— এ দেশে সবটাই তো ঠিক ছিল, সুন্দর ছিল জীবন। এ দেশের মাটি মায়ের মতো তাঁকে মমতা দিয়ে আগলে ধরেছে। মাঠের 'মানিকী মধুরী বানে' সাদা দুধ এসেছে মায়ের স্তন্যের মতো। তাঁর জন্য মধুতে ভরে উঠেছে কমলালেবুর কোয়া। প্রতিবেশি অসমিয়া মায়াবী মেয়েটি তাঁর মায়ার আঙুলে ফুল তুলেছে বিহুয়ানে। 'বিহুয়ান' কথায় অর্থ হলো বহাগ বিহুতে যে উপহার দেওয়া হয়, সেটা, এই বিহুয়ান তাঁকে লজ্জায় আরক্ত মানত হয়ে দিতে এসেছে মেয়েটি 'মেজি'— জ্বলা সাঁঝে 'তবু কখনও তাঁকে দু চোখের জল মুছতে হয়। কারণ তিনি নাকি বিদেশি, এ মাটি তাঁকে স্তন্য দেয়নি কখনও।

লুইতের পারের সাদা ধবধবে বালু যেখানে হয়তো কাছিমেরা ডিম লুকোয়, শৈশবে সেই বালু দুহাতে

খুঁড়ে কতই না বালুর বাঁধ বেঁধেছেন, আর অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেছেন। কিন্তু সে সবই এখন কেবল স্মৃতি— যা কবির মনকে নিরন্তর কুড়ে কুড়ে খায়। কেননা এখন যখন 'প্রাগজ্যোতিষের' অফিসে কবি যান চাকরির খোঁজে, তখন কবির ভাষাকে দাঁড়াতে হয় কাঠগড়ায়। কবিকে শুনতে হয় যে তিনি সে ভাষায় কথা বলেন তা খাঁটি লুইত পারের ভাষা নয়। তার অর্থ কবি লুইত পারের সন্তান নন। কবির মন মুচড়ে ওঠে 'অপমানে, বেদনায়'।

কবিকে যখন লজ্জায় আরক্ত মুখে উপহার দেয় 'তাঁতশাল শোভা বিহুয়তী মেয়ে' কিংবা রাতের রানি জোছনা যখন তাঁর উঠোনে হাসিতে ছড়ায় হিরার কুচি, ওরা তো চায় না কবির 'ডোমিসাইলের' লিপি। কিন্তু যখনই আবার তাঁর প্রাণভোমরা ভাইটিকে কলেজে ভর্তি করতে যান, কিংবা তাঁর 'এ্যান্টিকে ছাপা বই' খানি ছাপাতে চান তখন চর্তুদিক থেকে একটিই জবাব আসে যে তিনি যে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা, তা সম্পর্কে হাকিমের পরিচয় লিপিখানি কোথায়? কবি এই প্রশ্নকারীদের হাতে তুলে দেন জমির দলিল, 'খাজনার চিঠা।' কিন্তু এক নতুন আইন নতুন হাকিম তখন চোখ রাঙিয়ে মাথা নেড়ে কড়িকাঠে চোখ রেখে বলেন যে তাকে তাঁরা চেনেন না। কবিও অপারগ, আর কী-ই বা দেবেন পরিচয় পত্রের জন্য? কীভাবেই বা প্রমাণ করবেন যে তিনি লুইতের পারের ছেলে। এই অসম তাঁর অত্যন্ত আদরের মায়ের মতো। এভাবেই এই লুইত পারের সন্তান পাথরে মাথা কুটতে কুটতে চলেন, নিজের পরিচয় কে সাব্যস্ত করার পন্থা খুঁজতে গিয়ে। কিন্তু আশা ছাড়েন নি। তিনি তাঁর আশার কথা বলেছেন এভাবে।—

'বলি অধিকার বোধের আহত হৃদয় জ্বেলে

'ও মোর অসম দেশ সুচিকণ। আ মরি বাংলাভাষা।

মুহূর্তে যেন পাথরের ভার মন থেকে সরে যায়, এক—

ক্ষুব্ধ অভিমানী হৃদয় বলে ওঠে—

'এ মাটি আমারো এজমালী ঘরে শরীক কত না ভাই ;

কবি নানান ভাষাতে কথা বললেও তবু একটি কথাই—

'...আমাদের মন ভরে

একটি কথাই— মাথা উঁচু করে বাঁচতে। হাসতে চাই'

(১৯-এর কবিতা ও গান, পৃ. ১১)

এক আকাশ তারার দিকে চেয়ে কবি শান্তির ঘর খোঁজেন। কখনও 'মিকিরের চাঙে।' কখনও 'অসমিয়া গাঁয়ে', কখনও আবার 'ভগনীয়া বস্তিতে'। লুইতের কনে ঘর ভাঙে তবু বেহুলায় মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লড়াই করেন। পুঁই মাচায় যখন তাঁর ঘর ভরে তখন স্বস্তিতে মন ভরে ওঠে।

শাদা ধবধবে লুইতের পারের মাটিতে কাছিমেরা ডিম পাড়ে। কবির ভাইয়ের ঘুম চক্ চক্ করে বন্ধুত্বের ভালোবাসা। দীঘলি দিঘির কোলটায় বসে গান সে বারে বারে—

'ও মোর অসম দেশ মরমিয়া, আ মরি বাংলা ভাষা।'

আবার এই অসমের ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে ড. তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'ভূমিপুত্র জাতক ঃ ১৯৮৫'—

কবিতায় লেখেন 'কবি নতুন জাতক, ভূমিপুত্র, পরবাসী বোধিসত্ব' কিছুই নেই তাঁর। তাঁর কাছে সব দেশই বিদেশ।

কবির যেন মেধা নেই, বুদ্ধি নেই, ধাতুচক্র নেই, শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে মুখ গুঁজে খড় ও বিচালি খেয়ে যান। অর্থাৎ তাঁর কোনো নিজস্বতা বা আপনত্ব নেই। মাঝে মাঝে তাঁকে লিখতে হয় শ্রুতি দ্রাঘিমা— কোন রেখায় তিনি আছেন। নির্বিবাদে শিখে যান। প্রতিবাদ করেন না।

কিন্তু এভাবে জীবন কাটাতে কবি ক্লান্তি বোধ করেন। তাই লেখেন—

'বাচাল ছায়ায় যত বেড়ে উঠি
শস্য ভাঁড়ারের লোকে মাথা পুড়ি তত।
ত্রিপাদ 'ভূমির কথা মনে পড়ে, ব্রাত্য ব্রাত্যজন্মে
পরমান্ন নেই, নেই জেগে-ওঠা।'

(তদেব, পৃ. ৪৪)

— কবি বোধিসত্ব, নির্বিকার নতুন জাতক। তিনি চিরদিন প্রবাসী। তাঁর কোনো স্মৃতি নেই, পারম্পর্য নেই। শুধু আছ পোড়া মাটি, 'বাস্তুহীন ছায়ার আড়াল।' সব দেশই কবির কাছে বিদেশ।

আবার এই প্রসঙ্গ টেনেই আরেকজন বরাকের কবি কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য[৩২] লিখছেন— 'স্বদেশ হলো বিদেশ' নামের কবিতা। কবিতাটিতে কবি লিখছেন যে— দেশ জুড়ে টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এ আসলে বৃষ্টি নয় রক্ত ঝরার মর্মান্তিক ধ্বনি। প্রসঙ্গত বলে নিই 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'— বাংলার একটি বিখ্যাত ছড়া। অনেক দিন ধরার পর যখন টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যায়। মনটা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। ভিজে মাটির গন্ধ মনকে এক নতুন আস্বাদ দেয়। কিন্তু কবির বৃষ্টি নৃশংসতার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই টাপুর টুপুর শব্দে মানুষের অত্যাচারে নিহত কিংবা আহতদের রক্ত ঝরছে।

একদিন রাতে মানুষের পৈশাচিক মনোবৃত্তিও পরিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মতো নেমে এল। প্রচুর বাঙালি মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়লো। কবিও সেদিন বিচ্ছিন্নতার হাতে টুকরো হলেন। কারণ এ রক্ত তাঁর আপন ভাষা গোষ্ঠীর রক্ত। কী দোষ এদের? শুধু ভাষাটা এক নয় বলে কি তাঁদের এভাবে রক্ত ঝরাতে হবে?

দেশ জুড়ে সেদিন রক্ত স্রোতের বন্যা নামে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থ', সেদিন থেকে বিদেশ হয়ে যায়।

এ শুধু একটা ভাষার ব্যবধান কীভাবে মানুষকে এরকম পৈশাচিক জান্তব মানসিকতা দেয় কবি তা জানেন না, তিনি শুধু লিখলেন এখন থেকে তিনি বিদেশি।

আবার বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের[৩৩] কলমও সোচ্চার হয়েছিল অসমের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে তাঁর কবিতাটি পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে লিখলেও তা ততটাই প্রাসঙ্গিক হতো বলে আমার মনে হয়।

কবিকে প্রশ্নের কাঠগড়ায় এই মর্মে যে তাঁর কোনো ভাষা ধর্ম আছে জাতি আছে কি? আর স্থান কোথায় ভারতবর্ষ না অন্য কোনো স্থানে? যাঁরা প্রশ্ন করছেন তাঁদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দৃঢ়। কারণ তাদের নিজস্ব ভাষা

আছে, ধর্ম, আছে, নিজেদের জাতি আছে। জাতি ভিত্তিক ভোট আছে। কিন্তু কবির রাজ্য ও রাজধানী ভারতবর্ষ। তাই কবির চেহারা কেউ দেখেনি। 'তেত্রিশ বছর পেরিয়ে গেলো কেউ কথা রাখেনি'।

প্রসঙ্গত কবি এখানে নেতাজির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। নেতাজি বলেছিলেন 'তোমরা আমায় রক্ত দাও। আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো'।

'এক বুড়ো বলেছিল তোমরা আমার সঙ্গে উপবাস করো

আমি তোমাদের রামরাজ্য দেব

যুবক অন্তর্হিত, বুড়োর নাতি-পুতি

ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে নিজেদের চেয়ার টেবিল।'

(তদেব, পৃ. ২২)

— তাই এখন এই বিদেশি সংজ্ঞায় ভূষিত আমাদের দেখে তাঁরা উপহাস করেন। তারা বলেন না তোমরা রক্ত দিয়েছ, না উপোস করেছ। তাই তো আজ তোমাদের এই চেহারা। একদম চেনা যায় না। আর তাকে চেনা যায় না। তাকে চিনবেই বা কী করে? কেমন করে এই মহাপুরুষেরা বলবেন যে এই কাপুরুষেরা তাঁদের দেশবাসী। তাহলে তো ঠিকই আছে তারা তো বিদেশিই বটে। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেছেন—

তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি

কেউ কথা রাখে না।

বস্তুত বিজিৎকুমারের এই কবিতাটি পক্ষান্তরে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ সময়টা আটের দশক আর তখন অসমে ভাষা আন্দোলন একদম চরমে। যারা নিজের দেশের জন্য কিছু করতে পারেনি, তাঁরা যেখানেই থাক না কেন বিদেশি হয়েই থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা প্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে আবার বরাক পারের কবি সুধীর সেন[৩৪] লিখেছেন এই প্রেক্ষিতে 'হায়, মৃত মানবতা'। তিনি লিখেছেন এভাবে —

অসম আন্দোলনের সময় যারাই ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, জনপদ ছারখার করেছে, বাঙালিদের ভাই বোন জননীর শিশুর রক্তে হাত ভিজিয়েছে তার লুকোবে কোথায়? হঠাৎ ভূঁইফোঁড় এই ভূমিপুত্রদের কবি বলছেন যে তারা এক একটা নিহত বিবেক, নিহত হৃদয়ের অধিকারী। কোথায় মানবতা? 'নেপথ্যবাসী খলনায়কেরা যারা মুদ্রার ক্রীতদাস।'

লুইতের এই ধারা পশ্চিমে যায়, নিজেই সাজায় রূপসী বাংলাদেশকে। তারা কি পারে এই লুইতধারার গতি ফেরাতে? উপহারস্বরূপ বারবার বাংলা দেশের মেঘদল আসে অসমের মাটিতে ফসল ফোটাতে, তাকে শস্যশ্যামলা করতে। পারে কি এই নৃশংস বিবেকহীন লোকগুলো তাদের ফিরিয়ে দিতে।

বন্যা ও ভূমিকম্প, কিংবা দাবানল অথবা মড়ক ঘূর্ণিঝড় ছুটে যখন আসে তখন ভাষা-ধর্ম জাতির দোহাই দিয়ে কেউ রক্ষা পেয়েছে কি? একথা কি বলতে পেরেছে তখন তারা অসমিয়া, বাঙালি, পাহাড়ি, হিন্দু বা মুসলমান — প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন তাদের রক্ষা করে।

এর উত্তর জানে আদিকাল ধরে বয়ে আসা লোহিত বা ব্রহ্মপুত্র, জানে নীল পাহাড়েরা আর জানে কাজিরঙা বন।

এমনি করেই আরও কতবার মানুষ নামক জন্তুর তাণ্ডবে ছাড়খার হয়ে গেছে ঘরবাড়ি সংসার ভাগারে কত শকুন, দেশি শেয়ালেরা নেমেছে, বাজ পাখির নখ কত হৃদয় ছিন্ন করেছে। তবু শান্তির পায়রা একদিন আসবেই। শ্মশানে আবার নতুন জীবন বাঁধবে, ঘর বাঁধবে।

'হৃদয়ের শ্লোক হয়ে নামে শব্দের সিঁড়ি বেয়ে

বিধবা স্মৃতির পাশে এসে স্থির, নিশ্চুপ সান্ত্বনা'

(তদেব, পৃ. ৮)

কবি আশাবাদী এই ক্রোধের আগুন নিভলেই দ্বেষরূপী কেউটেকে বশ করবে ভালোবাসা। মৃত মানবতা একদিন আবার জেগে উঠবে,

— আশা বন্দরে এই ভারী বিশ্বাস

নোঙর ফেলেছি, হে আসাম, কবে শম্বুক হবে শঙ্খ সমুদ্রেরা

প্রত্যেক কবিই অসম আন্দোলনের ভয়াবহতার চিত্রই এঁকেছেন। কিন্তু তাঁদের সকলের সঙ্গে কবি সুধীর সেনের তফাত এখানেই যে তিনি আশাবাদী কবি। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস এই হিংসার আগুন একদিন নিভবে। আবার বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রদীপ জ্বলবে। আবার এদিকে অসমিয়া কবি দিলীপ ফুকনও[৩৫] অসম আন্দোলনের এই ভয়াবহ দিনগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। বস্তুত জীবনী সাহিত্যের দর্পন, একথাটা এখানে প্রমাণিত হলো। তাই তো কবি অসম-আন্দোলনের সেই দিনগুলোর নাম দিয়েছেন হন্তারক দিন। কবি লিখছেন—

'শবদেহের থাকে না কোনও নাম

কিছু একটা নাম ছিল তার।

বাতাসে শুকনো পাতা ঝরে পাড়ার মতো

সমস্ত তুচ্ছতা তার ফেলেছিল ঝরিয়ে

আগুনে জ্বলছিল হৃদয়।

সকল আদিম বৃক্ষ

ছিল নিথর হয়ে প্রেক্ষাগৃহে।'

(স্বরাজোত্তর প্রজন্মের অসমিয়া কবিতা, পৃ. ২০)

আবার রফিকুল হুসেন[৩৬] রাতের বৈরাগী, কবিতাটি গহপুর ও নেলিতে যে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তারই রেশ টেনে এনেছেন এ কবিতায়।

'সংবাদ শিরোনামে যখন গহপুর—নেলি

কোন পথ ধরে ওগো বৈরাগী

দুপুর রাতে এসেছ তুমি

ভাঙা একতারায় বেঁধে এনেছ কার

পোড়া কুটিরের আর্তনাদ

তুমি মুখ মেললেই দেখি উড়ে আসে পোড়া মাংসের ছাই

.....

কোথায় তোমার চোখ দুটো জিহ্বা কোথায়

কে কেড়ে নিয়েছে তোমার জিহ্বা আর চোখ দুটো'

(তদেব, পৃ. ৩০/৩১)

আন্দোলন, দাঙ্গা যা-ই থাক না কেন মানুষ আদতে প্রেম ছাড়া বাঁচতে পারে না তাই অসম বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, বস্তুত সাহিত্যের অন্যতম মূল উপাদান প্রেম, অবশ্য শুধু সাহিত্যেরই বা বলি কেন, প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার ভিতটাই তো প্রেমের ওপর গড়া। আর তাই দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু চেতনা, ভাষা আন্দোলন, স্থানিকতা সব কিছুর উপরে অসমের বাঙালি কবিদের প্রেম যেন এক চলমান জীবন স্রোত।

'বাড়ি ফিরে তুমি কার সাথে কথা বলো

চোখ তুলে কাকে দেখাও অসীম ইচ্ছের দহন

কাকে দিতে চাও অকারণ বৃষ্টিপাত

হাতভরা সুখের সন্ধান...'

(আমাকে এভাবে ভাবো, পৃ. ৭)

এই কবিতার নাম 'আমাকে এভাবে ভাবো,'[৩৭] লিখেছেন দীপিকা বিশ্বাস[৩৮]। আবার শক্তিপদ ব্রহ্মচারী লিখেছেন—

যে মেয়েটি রোজ আসত তোর কাছে এখন কোথায় তার বিয়ে হয়ে গেছে? ভালো ঘর, ভালো বর পেয়ে গেছে সে? ঠিক এভাবেই বরাক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নির্বিশেষে কবিদের কলমে প্রেম খেলা করেছে বিভিন্ন অনুসঙ্গে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীকে দশকওয়ারি বিশ্লেষণে নব্বইয়ে রাখতে হবে। তাঁর একমাত্র কবিতারই 'তরঙ্গতাড়িত'[৩৯] প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। তিনি সম্পাদনা করেছেন 'মহাবাহু'[৪০] পত্রিকা। অসমিয়া বাঙালি সম্পর্ক নিয়ে যাঁরা লেখালেখি করছেন বা করেছেন তিনি সেই তালিকার উপরের দিকে থাকবেন। এবং তিনি হচ্ছেন বহির্বিশ্বের কাছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি মুখ।

কবির প্রায় প্রত্যেক কবিতায় জড়িয়ে থাকে স্থানিকতা ; মৃত্যু চেতনা, তাঁর অতীত এবং তার সঙ্গে প্রেম। তাঁর কবিতায় প্রেমটা ঠিক উৎকট যৌনতা বা খেলো হয়ে আসে না। পাশাপাশি থেকে যায় হয় মৃত্যুর হাতছানি অর্থাৎ পরিণত বয়সের প্রেম নয়তো তার অতীত বা স্থানিকতার সঙ্গে প্রেমের মিশ্রণ। কবি তাঁর

কাব্যগ্রন্থ ‘কুয়াশালিপি’র প্রথম কবিতায় লেখেন—

‘গানের ওপারে থাকে শুধু গান।
আর কিছু থাকে না তো নিবিড় ভালোবাসায়
মৃত্যুর ওপারে যেমন মৃত্যুই শুধু।

যে কোনো মুহূর্তে খসে যেতে পারে প্ল্যাকটার্ম,
প্রিয় মৃত্যুটি অপেক্ষা করে কাছেই, চুপচাপ,
তোমাকেই আঁকড়ে ধরি আরও
আরও ঘন হই তোমারই শ্বাসে
প্রতিটি মুহূর্ত তোমাতেই বাঁচি, অনুপম।
ওই যে দেখা হয়েছিল কাব্যপাঠের আসরে,
নিপাট উত্তর পূর্বের মিস্টিক সাজে,
সাজ তো নয়, তোমার গভীর টান
যে টানে ডুবে যায় গিটার
প্ল্যাকটার্মটি অবিকল ধরা থাকে আঙুলের ফাঁকে
ডুবে যাওয়া গিটারের সমস্ত সুর
মিশে যায় প্রবাহিত জলে।’

(কুয়াশালিপি, পৃ. ৯)

এবার কবি ডুব দেন পাহাড়ে। কারণ এই নীল পাহাড়টা তাঁর নিজের অত্যন্ত আপন। এক্ষেত্রে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পাহাড় ঘেরা। এখানেই কবি আবার স্থানিকতায় ফিরে আসেন।

‘এবার পাহাড়ে ডুব দিই, নীল পাহাড় আমার
হেঁটে হেঁটে কেমন চলে গেছে দ্যাখো, সীমানার ওপার
ওপারে ইগল সৌথান, তার কমলা লেবু গাল
গাল হাসে পাহাড়ের সহজ সরল নিটোল
খাসি মেয়েটির রবীন্দ্র সংগীত যেন,
তোমার, বাকি থাকা পল অনুপল
তোমার গানেই তো আমার কাঙ্ক্ষিত মরণ!’

(তদেব, পৃ. ৯)

এবার কবি বলছেন সব গানেই তাঁর কাঙিক্ষত মরণ থাকে। থাকে রাতের এস.এম.এস। এবং কবি খুব সুন্দরভাবে এবার এগিয়ে যান এই বলে—

'একথা একাকী জানে গীতবিতান
জানে প্ল্যাকটার্ম, কানে দ্রবীভূত গিটার
জানে ফাগুন হাওয়া, জানে শিশিরের টুপটাপ
জানে শুভমিতা, জানে টোয়েন্টি মিনিট ফোন কল।
এই হৃদয় তোমারই সুরে ডুবে যাক
যে সুর তোমার নিটোল হাতের পরমান্ন
যে সুর হাত ধরাধরি করে কাজিরঙায় রাত্রিভ্রমণ
যে সুর অসুখের শিয়রে কপালে শীতল হাত
যে সুর হঠাৎ দুপুরে দূরভাষে এমনি আলাপ
পাশে থাকা পর শুধু
ঘন হও আরও
এতই ঘন
মৃত্যুও যেন থাকে অপেক্ষায়।'

(তদেব, পৃ. ৯/১০)

এই কবিতায় কবি খাসি মেয়েটির গলায় রবীন্দ্রসংগীত শুনে অবশ্যই মুগ্ধ হয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতটা তাঁর অত্যন্ত আপন প্রাণের কাছাকাছি। পাশাপাশি খাসি মেয়ের গাওয়াটা কবির প্রাণকে ভরিয়ে তুলেছে। বস্তুত একটি পাহাড়িয়া মেয়ের গলায় তার অত্যন্ত আপন রবীন্দ্রনাথ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'সরস্বতী পুজোর মেয়ে' কবিতাতে কবি মৃত্যুচেতনার সঙ্গে প্রেমকে যেন একাকার করে ফেলেছেন। একথা সবাই জানে যে সরস্বতী পুজো বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে, আর শুধু বাঙালিই বা বলবো কেন— পুরো অসমেই এই দিনটায় প্রেমিক প্রেমিকার খুল্লম-খুল্লা পেয়ার দিন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া হওয়ায় তো এখন কাছাকাছি না থাকলেও একজন আরেকজনের স্পর্শ না পেলেও স্কাইপে কিম্বা ভিডিওতে বসে একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে এবং অবাধ গতিতে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কবির স্বরস্বতী পুজোর মেয়ে কিন্তু ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মেয়ে নয়। সে নিতান্তই সহজ সরল সলজ্জ প্রেমিকা। তাই তো কবি লেখেন—

'এই একটি দিন আমি এলোমেলো
এই একটি দিন, চোখের গরল ঢালো

নিত্য হাতে সাজিয়েছি শরীরের পশরা যত
আজ তছনছ হব, শরীর ভরে নেব দৃষ্টিক্ষত
কোনরে রেখেছি ঘাম তালে নদীর তীব্র বাঁক
পাড় ভাঙুক তোমার, সব পুড়ে হয়ে যাক খাক
নিজ হাতে খোলো, আবরণ ; লজ্জা সকল
গ্রহণে কোনো চাকুকলা নেই দানই তুমুল আত্মসমর্পণ'

(তদেব, পৃ. ১৭)

কবি প্রেমিকার সঙ্গে হারিয়ে যেতে চান মৃত্যুর শয়নে। তাই কবি বলে ওঠেন—

'হারাই চলো, এক মহামরণ যানে
অস্তাচলে যায় সহমরণ
সঙ্গী হবে না, শেষ দহনে,
এই নাও তাহলে,
পিঠ রেখেছি খোলা, বেহিসেবি
তোমার চোখের আলোর শিরে অবাধ্যতায়
কলঙ্ক রচিত হোক চিরকালের
আমি সেই চন্দ্রক্ষত নিয়ে একাই
চিতার ফাগুনে নাইতে যাব।'

কবির আরেকটি কবিতায় তাঁর কবিবন্ধু অমিতাভ দেব চৌধুরীর 'আবাহন' কবিতা পড়ে তাঁর এক অক্ষম ভালোবাসার বয়ান। কবিতার নাম 'দেবী ফিরে আসবে'— দেবীটি কে আসলে তা কবি এখানে উহ্য রেখেছেন। এই দেবী কি আসলে কবির প্রেমিকা? যে যাই হোক কবিতায় কিন্তু মৃত্যু এবং প্রেম সঙ্গে এক করুণ সমর্পণ তিনটেই ফুটে উঠেছে। কবি লিখছেন—

'দেবী আর ফিরবে না
একটি অশ্রু গানের মতো
পড়ে থাকবে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে
অন্ধকার টেবিলের স্বল্পায়িত চতুর্ভুজে
কাঠ আর ও ঘন আঁধার হবে।

দেবী আর ফিরবে না

কাকে তুমি 'রাত থেকে কালো সুর' নিয়ে

মেঘের ছায়ায় চুলে স্নানের সৌরভও স্বচ্ছতা দেবে কবি?

বরং ধরো দেখি একখানা জম্পেশ রাম প্রসাদী

পাহাড়ের পাদদেশে থেকে দুহাতে মেখে নেব

সহজ জীবন প্রণালী, তারপর রাতের দুটিতে মিলে

'গান শুধু গান আর স্নান শুধু স্নান।'

(কুয়াশালিপি, পৃ. ১৯)

এবার কবি বলছেন হৃদয় চিরে ডাক দিলেও দেবী আর ফিরবে না। এখানে প্রসঙ্গত 'তেরি কসম' সিনেমার কিশোরের গলায় সেই বিখ্যাত গান—

"জিন্দগি কে সফর মে গুজর যাতে হ্যায় যো মকাম

বো ফির নহি আতে"।

— অর্থাৎ জীবনের যে সময়গুলো পেরিয়ে যায় শত চেষ্টা করলেও হৃদয় নিংড়ে নিলেও তা আর ফিরে আসে না। তবে কবি এখানে একটু শক্ত হয়েই বলে ওঠেন তার দেবী যদি আর না ও ফেরে তবে—

"চলো বন্ধু, মালির ভাটিয়ালিতেই সহমরণ হোক প্রথমবারের মতো ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে জ্বেলে উঠুক চিতার আগুন।"

অভিজ্ঞান বড় হচ্ছে বয়েস বাড়ছে আমাদেরও অথচ দেবীর কাছে এখানো কী করুণ সমর্পণ কবি আবার বলছেন দেবী আর না ফিরলে কবি নিজেও অক্ষরহীনতায় শূন্য পাত্রটি শুধু হয়ে থাকবে। দেবী তার কাছে ফিরুক আর নাই বা ফিরুক কোই বাত নেহি।

"দেবীরও বয়েস বাড়বে একদিন, লোলচর্ম বৃদ্ধা হবে,

কোনো প্রেমিক পুরুষ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

তখন শুধু আমি এই আমি ; তোমার পাশে এক অবোধ বালক ফিরে এসো দেবী

অক্ষরহীন মৃত্যু দিও না"।

কবির কবিতার সুর পাল্টে যায় 'চুম্বন টিপ' কবিতায়।

সেখানে চুম্বন থাকলেও তা যেন দহন যন্ত্রণার সুখ।

"একদিন সবাই চলে যাবে যে যার পথে

সেই পোড়া গোধূলিতে, শুধু তুমি আর আমি,

ফিরে যাব সেইসব দিনগুলি, তোর কাছে

আমার সোনা মেয়েটিও ফিরবে পদ্মদাস কলোনি,

ফিরবে সবুজ জামা গায় এক অবাক সকাল।

দুহাতের আদরে গলা জড়িয়ে

সহাস্যে চুম্বন করোনি তো কখনো দেবী,

অথচ কত অক্ষৌহিনী চুম্বনে তছনছ করেছ

এই ক্ষণজীবন,

দহনেও এত পোড়া সুখ, আগুন কি তা জানে

—একটি তারা মোক্ষম চুম্বনটিপ, ওই কপালে।"

কবি বলছেন ভালোবাসায় মধুর রাতগুলো জানে কবি তাঁর প্রেমিকার কাছে কতটা ঋণী। তাই কবি বলছেন তিনি শুধু তারই আদর। তিনি নিজেও তারই। এই প্রেমিক কখনো লাফ দেয় না।

শুধু— "ধীরে এসে দাঁড়ায় সামনে

তার ভালোবাসার কাছে।"

কবি সঞ্জয়ের 'রয়েছ নয়নে' কবিতায় একটু রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া আছে বলে মনে হয়। কবিতাটি শুধু হচ্ছে এভাবে—

'ও মালিনী, কে তুমি, রচিছ মালাখানি

আজ কবি ঝরা আষাঢ় সন্ধ্যার ভরা বাদরে!

সে কি তোমার চোখের জলের গানটি করে, একা অন্দরে?

কোনো চন্দ্রিমার কামনাপিচ্ছিল আস্তর নেই তো কোথাও

তাহলে একলা, একলাই চলো রে'

(তদেব, পৃ. ২৯)

কিন্তু কবিতার শেষের দিকে কবি আবার নিজের সুরে ফিরে আসেন।

"ওহে সমাধিফলক, বালিকাটি কেন টানে এত

বারংবার রিক্ত হয়েছি তোর পদাশ্রয়ে

বালিকা তার সমস্ত গৌরভ আমাকে বিলিয়ে নিজের

বসন্তটি করেছে শ্মশানভূমির মতো ছাইমথিত

এত বেশি ভালোবাসা, ভালো নয়, ভয় করে।"

কবি এবার জীবন নিয়েই মৃত্যু মুখের গানে 'উৎপাত' করতে মুখর হয়েছেন। পাহাড় চূড়ার পদতলে জনজাতির গ্রামে কলস পূর্ণ মদিরা পান করবেন তিনি। কারণ তিনি তো যোগ্যতার ঘুড়ি নন যে আকাশ দাপিয়ে বেড়াবেন। তবু কেন মানুষেরা ভালোবেসে ফেরী দিয়ে যায়। তাই কবি এবার—

"ভালোবাসা শব্দটিকে মদে চুবিয়ে গলায় চেলে দেব নোশায় টলতে টলতে খুঁজব ভালোবাসাকেই।

সে তখন আমার উদরে এক বিব্রত নিঃশরীর।"

কবি সঞ্জয়ের আরেকটি কবিতা 'তোমাতেই বিলীন' এখানে কবি প্রেমের যেই প্রাপ্তির টানে নিজের জীবনকে স্বেচ্ছায় হারিয়ে ফেলেছেন সেই অনাবিল আনন্দে।' প্রেমের সার্থকতায় যে আনন্দ তা অতি মনোরম। প্রেমের মিলনের মধুর সময়গুলি প্রেমিক পেমিকার জীবন ভরের সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়।

তাই কবি লেখেন —

'পরিমাণ মতো আলো দিলে,

আমি রয়ে যাব তোমার কাছে।

খুলে দেব লজ্জাকুন্তল, খুলে দেব তালা

শরীর ভরে এঁকে দেব রাশি রাশি তারা।

পরিমাণ মতো রাত্রি দিলে,

আমি রয়ে যাব তোমার কাছে।

তোমার বুকের জমাট মেখে,

পালকের মতো নবম আদর

স্থাপন করকে ঠোঁট।

পরিমাণ মতো শ্রাবণ দিলে,

আমি তোমার পায়ের পাতার কাছে

রয়ে যাব বৃষ্টি কোলাহল মুখর।'

(তদেব, পৃ. ৪৫)

কবি বলছেন তিনি এখনই যাবেন না তিনি শ্বেতপত্রে খোদাই করে রাখবেন বাংলা বর্ণমালা অক্ষম হস্ত বাটালিতে। কবিকে সে পথ দেওয়া হয়েছে সামান্য কবি জন্ম তো তারই পাদুকা আশ্রয়ে। তাই ;

"মৃত্যুর সঙ্গে কোনো বনিবনা নেই

শর্তহীন পাশে দাঁড়ালে

তোমাতেই বিলীন।"

কবি সঞ্জয়ের অন্য একটি কাব্যগ্রন্থ 'সঞ্জয় উদাস'[৪১] কবিতায় প্রেমটা শুধু ছুঁয়ে থাকা এ কোনো শরীরী স্পর্শ নয়। তাই কবি লেখেন—

'সারাদিন ছুঁয়ে রইলে আমায়। স্পর্শ করোনি তো একবারও

জীবনে ক্ষত-এত, তোমার ছোঁয়ায় সকল চন্দন সুরভিত

এভাবেই ছুঁয়ে থাকো মৃত্যুর ও ওপারে

ছুঁয়ে থাকা অবুঝ ভীষণ, সবাই কি পারে'

(সঞ্জয় উদাস, পৃ. ১২)

তাঁর জন্য একটি কবিতায় প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হওয়া এবং কথা হওয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অজান্তেই এক মৃত্যু চেতনা কাজ করে গেছে। কিংবা হয়তো সঞ্জয় জেনেও নেই এই চেতনাকে ধরে রেখেছেন।

"তোমার সঙ্গে কথা হবে না আর কোনোদিনও, কথা হবে রোজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে না আর কোনোদিনও, দেখা হবে রোজ আমি তো থাকবো না একদিন, শ্রাবণ মাখা সে পথ সর্বদা আনন্দ লালন করে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো তখন সঞ্জয়ের কুশল। ("সঞ্জয় উদাস" কবিতা সংখ্যা—৬)

—এই কবিতাটিতে কবি তাঁর প্রেমিকার কথা বলেছেন। তাঁর কবিতায় রয়েছে বাস্তবেই সেই চিরন্তন সত্য বাণী, সেই মৃত্যুর বাণী। এখানে তিনি বলেছেন প্রেমের শুদ্ধতা মৃত্যুকেও জয় করে। তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে প্রতি দিন কথা বলা সম্ভব নাও হতে পারে। এমনকি তিনি তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে চিরদিন না থাকাটাও সম্ভব হতে পারে প্রেমের পথে যে আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দের ধারাও সময়ের সঙ্গে কমে যেতে পারে। কিন্তু চিরতরের জন্য সেই প্রেম বিলীন হয়ে যাবে না। কারণ শ্রাবণমাখা যে পথ আনন্দকে লালন করে কবি যে সে আনন্দেই প্রতীক। তাই কবি নিজের নাম উল্লেখ করে বলছেন যে সঞ্জয়ের কুশলবার্তা সেই শ্রাবণমাখা আনন্দ ঘন পথ।

সঞ্জয় এমন একজন কবি যিনি তাঁর প্রেমিকাকে বাস্তবের পথ দেখিয়েছেন ও সে পথে চলার জন্য মনে সাহস জুগিয়েছেন। জীবনের অন্তিম পর্যায় হল মৃত্যু সেই মৃত্যুর ফলে জীবনে চলে আসা দুঃখকে জয় করার যে প্রচেষ্টা তিনি সেই প্রচেষ্টার বীজ তাঁর প্রেমিকার মনে বপন করতে চেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে যেন তাঁর প্রেমিকা ভেঙে না পড়ে সেই মনোবল গড়তে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে

তাই তিনি বলেছেন—

"আমার নিথর বুকের ওপর তোমার আছড়ে পড়া চলবে না—

শরীরের প্রকোষ্ঠে যে অতীব নদী, তার জল রইল

মাঠ শস্যময় হবে, সুমঙ্গল ধ্বনিতে ভরে যাবে ঘরদুয়ার

চোখে তোমার রাখবে না জল, অশ্রু কুসুম আমার ভালো লাগে না।"

(তদেব, পৃ. ১৬)

কবি একটি মেয়েকে ভালোবাসেন। কিন্তু মেয়েটিকে সে ভালোবাসার প্রস্তাব দিতে গেলে মেয়েটির উত্তর কি হতে পারে তাতে কবির সন্দেহ আছে। কবি ভেবে নিয়েছেন হয়তো বা মেয়েটি বলবে নিশ্চয় তার কোনো সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক আছেই। যার সঙ্গে সারারাত সেনা ঘুমিয়ে কথা বলে। তাই কবি

লেখেন—

"আছে তো, সম্ভ্রান্ত থাকুক, আমার কী আসে যায়

আমার মুখাগ্নি হবে, মেয়েটির হিরণ্ময় মুদ্রায়"

(তদেব, পৃ. ১৯)

বস্তুত কবি বলতে চাইছেন মেয়েটি যদি সারাজীবনব্যাপীও কবিকে ভালো না বাসেন তাতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যখন এই যাপনের নাম জীবন শেষ হবে এবং একদিন কবির মৃত্যু আসবে তখন অন্তত সেই মেয়েটির হাতেই যেন মুখাগ্নি হয়। অন্তত শেষটায় কবি তাঁর ভালোবাসার পাত্রীকে পেতে চাইছেন। প্রসঙ্গত এখানে অসমের বিখ্যাত নব প্রজন্মের গায়ক জুবিন গার্গের "Gangstar"–এর সেই বিখ্যাত গান 'ইয়া আলি'র কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে নায়ক কিংবা গায়ক গেয়ে ওঠেন—

'মিলে কুছ পল এ কুরবত কে

ফকির হয় তেরি চাহত কে

রহে বেচেন দিল কব তক

মিলে কুছ পল তো রাহত কে

চাহত পে ইস্ক পে হা মিটা দু

লুটা দু ম্যায় অপনি খুদি'

— অর্থাৎ কবি যেমন চেয়েছেন তাঁর শেষ হোক তাঁর ভালোবাসার হাত ধরে। তেমনি এই গানটিতেও বলা হচ্ছে যে কিছুটা অন্তত শান্তি তো পাওয়া যাক প্রেমিকাকে ভালোবেসে। কতদিন আর মন অশান্ত থাকবে শেষমেশ প্রেমিকার জন্য ও প্রেমে নিজেকে শেষ করে দিয়ে খানিকটা শান্তি তো পাওয়া যাবে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই মুহূর্তে খুব বেশি নারী কবিতা লিখছেন না। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে শিপ্রা দাস[৪২] এখন আর তত সৃষ্টিশীল নন, মহিলা কবি একটা লঘু তকমা, তবু বলতে যদি হয়, দীপিকা বিশ্বাসই সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। এবং জয়িতা দাশ পুরস্কায়স্থের[৪৩] কথাও উল্লেখ্য, তিনি সম্পাদনা করেন 'জললিপি'[৪৪] কবিতাপত্র। নাম শুনে মনে পড়ে যায় সঞ্জয়ের কাব্যগ্রন্থ 'কুয়াশালিপি'[৪৫]-র কথা। অমিতাভ দেব চৌধুরীর[৪৬] এরকম একটি কবিতা রয়েছে, যার নাম 'পাণ্ডুলিপি'। আবার অসমিয়া জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গ-এর[৪৭] অ্যালবাম-এর নাম— সংগীতলিপি। কয়েকটি ভালো কবিতা লিখে একেবারে থেমে গেছেন সম্ভাবনাময়ী জাহ্নবী দাশ[৪৮]। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরীর[৪৯] কথা। 'ময়ূখ' পত্রিকা বেশ কয়েক বছর যাবৎ সম্পাদনা করলেও তিনি সৃষ্টিশীল কোনও লেখা আমাদের উপহার দেননি। একই গোত্রে ফেলা যাবে না রাধা দত্তকে। কেননা তাঁর সম্পাদিত 'পূর্বদেশ গল্পপত্র'[৫০] শুধুই গল্পের কাগজ। এখন পর্যন্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে দীপিকার। 'আমাকে এভাবে ভাবো',[৫১] 'জীবন যার নাম[৫২] ও 'আমি কোনো দিন বিধবা হব না'[৫৩]। দীপিকার কবিতায় বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। কবি লেখেন— বাড়ি ফিরে তুমি কার সাথে কথা বল চোখ তুলে কাকে দেখাও অসীম ইচ্ছের দহন কাকে দিতে চাও অকারণ বৃষ্টিপাত হাত ভরা সুখের সন্ধান... ঘরের ভেতর নিয়ে যায়।

'কে তোমাকে দরজা থেকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়

কে তোমাকে প্রতিদিন পুরনো হৃদয় খুলে

নতুন হৃদয় জুড়ে দেয়

কাকে তুমি ভালোবাসো আনত তৃষ্ণায়

সে কি কোনো বন্ধু?

কোনো অস্থির হাওয়ার ঝড়?

অথবা ; আমি শূন্য ঘরের বিবর!

(আমাকে এভাবে ভাবো, পৃ. ৭)

দীপিকার অন্য একটি কবিতার নাম 'রাত'।

খুব সহজ-সরল ভাষায় তিনি তাঁর প্রেমিককে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই কবি কিছুটা যৌনসন্ধি হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। তাই তিনি বলেন—

'তুমি এলে, রাত ভরে গেল পূর্ণ অন্ধকারে

দিনের আলোর আর প্রয়োজন রইল না।'

(তদেব, পৃ. ৮)

কবির প্রেমিক চলে গেলে তাঁর চোখ জল ভরে যায় আর যখন সারা রাত চোখের জল ঝরতে থাকে তখন দিনের আলো ঝাপসা মনে হয়। তাই তিনি লেখেন—

'তুমি চলে গেলে

রাত বয়ে যায় চোখের জলে

দিনের আলোয় কিছুই আর চোখে পড়ে না।'

(তদেব, পৃ. ৮)

কবি 'কোলাহল' কবিতায় প্রেমিক দূরে থাকলে তার চিন্তায় প্রিয়তমের জন্য সে ব্যাকুল মনোভাবের উদয় ঘটে সেই কথাই কবি এই কবিতাটিতে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

'তুমি পাশে নেই

বিষাদের অন্যতম রূপান্তরে

সোজা হয়ে হাঁটে নিশাচর রাত

.....

তুমি পাশে নেই

অস্তিত্বের সংকট

প্রাকৃতিক কোলাহল তীব্র হয়ে বাজে।'

(তদেব, পৃ. ১১)

'একা' কবিতাটিতে কবি তাঁর মনের অতলে এ যে একাকিত্ব লুকিয়ে রয়েছে তা তিনি নির্জনতায় বসে অনুভব করতে পারছেন। তাঁর চারপাশে লোকজনের কোলাহল থাকা সত্ত্বেও তিনি মন থেকে একা হয়ে রয়েছেন। তাঁর এই উদাস ও একলা মনোভাবের যোগ্য প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে।

তাই তিনি কবিতাটিতে বলেছেন—

'খুব নির্জনে বসে আছি একা
মানুষ মানুষ নাই
তাই নির্জনতা।'

(তদেব, পৃ. ১৬)

কবি 'প্রহসন' কবিতাটিতে লিখেছেন রূপালি জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতে যেতে স্বপ্ন কামনা করছিল কোনো স্বল্প বাস নারী। তারপর কবির ভাবনা এরকম—

'ভরা নদীর ভেতর ডুবে যাচ্ছিল পোড়া বাসর
এবং সমস্ত ইঙ্গিত পূর্ণ ভয়ের কুহেলি
সে তার পোশাক খুঁজে নিতে চেষ্টা করছিল
আলোয় দেখা সুতোর বুননে
শেষে আকাশটাই গায়ে জড়িয়ে গেল
আলোর ইতিহাস সহ অদ্ভুত প্রহসনে।'

(তদেব, পৃ. ১৮)

"আমি কখনও বিধবা হব না" কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা—

"আমাকে আঘাত কোরো না" কবিতায় কবি তাঁর প্রেমিককে বলছেন— তিনি যেন তাঁকে আঘাত না করেন। কারণ বার বার আঘাত মেনে নেওয়ার জন্য তাঁর জন্ম নয়। এই প্রসঙ্গে কবি তাঁর মার কথা উল্লেখ করে বলেন—

'মা বলেছিল, যখন শব্দ আসে না
আকাশের দিকে চেয়ে গভীর প্রার্থনায়
অস্ফুট শব্দগুলি নিশ্চয়ই কথা হবে
মা বলেছিল অস্থির পথের ওপরই স্থিত থাকে
রোদ-ছায়া উল্লাসের বৃষ্টিধ্বনিগুলি

তুমি সেই অস্ফুট শব্দগুলো মেলে দাও

রোদ্দুরের দিকে, আমাকে আঘাত কোরো না।'

(আমি কখনও বিধবা হব না, পৃ. ৭)

চাঁদ ও শিশিরের স্বাদ কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়জন কোনো ব্যক্তিকে বলছেন ঘাসের ওপর না বসতে, কারণ ঘাস ও শিশিরের মধ্যেকার প্রেম তিনি জানেন। ঘাস একাই শিশিরের সবটুকু বোধ বুকে পেতে নেয়। কবি মেঘের নীচেও বসতে বারণ করছেন কারণ মেঘরা শুধু বিদ্যুতের আলোক ঝলকান দেখাবে। বস্তুত কবি প্রেমকে সমস্ত বোধ দিয়ে পেতে চান। তিনি ফিরে যেতে চান না। তাই তিনি লেখেন—

'এখানে বোসো না নদীর কিনারে

তৃষ্ণার জল কখনও দেবে না যে

ফেরাবে হা-হৃদয় লবণাক্ত বোধ।

এখানে চাঁদছায়া ফেলে কোথায় পালালে আজ

বজ্র-বিদ্যুৎ খোঁজে নদীতে পায়ের ছাপ

বৈদ্যুতিন আসরে তুমি কি পেয়েছ চাঁদ ও শিশিরের স্বাদ'

(তদেব, পৃ. ১৫)

দীপিকা তাঁর আরেকটি কবিতা 'হেঁটে যাই'-তে বলছেন তাঁর মনের নিবিড় কলতানকে নদীর থেকে খুঁজে নিতে। পাখিকে বন্দি করে বোঝা যায় যে সে অকারণেই বন্দি হয়ে আছে অর্থাৎ ওড়াটাই তার চিরন্তন অভ্যেস যেমনটা প্রেম মানুষের জীবনের এক চিরন্তন গতি। তারপর কবি বলেন—

'আমার ভেতরে দ্যাখো গহন চলাচল

দাসত্বের সর্বময় পরাধীনতায় উজ্জ্বল

চলো হাত ধরে হেঁটে আসি বনের ভিতর

আমাকে প্রতিদিন বেদনার দিকে ঠেলে দাও

শরীরে ও মনে নীরবে নির্জনে

পাখিদের দিকে হেঁটে যাই...'

(তদেব, পৃ. ১৬)

"নদীর ফেরানো মুখ" কবিতায় দীপিকা একদম সম্পূর্ণ প্রেমিকা হয়ে উঠেছেন। তিনি লিখছেন যে অনেক রাত হলে বোধহয় নদী জেগে উঠবে। কবির সাথে কবির প্রেমিকা গভীর কথায় ব্যস্ত হবে। আর তাই এই জন্যই একটা বই হাতে খেলার ধরে ঢুকে রাত জাগেন দীপিকা। তারপর দীপিকা বলেন—

'কিন্তু এসএমএস-এ অন্য হাত এসে পৌঁছোয়

বইয়ের ভেতরে সহবত মুড়ে খেলাঘরে মিশে যাই

নদীর ফেরানো মুখ টেনে নিয়ে যায় অতি— বসন্তে

ওরাও তোমার মতো হাসে, কাঁদে

এবং চলন্ত ট্রেনের দরজায় ছেড়ে দিতে চলে যায়

রাত ও বসন্তের বিরোধে আমি জেগে কাটাই সারারাত।'

(তদেব, পৃ. ২০)

দীপিকা বিশ্বাসের তৃতীয় বই 'জীবন যার নাম'— কাব্যগ্রন্থটি তাঁর অসুস্থ থাকাকালীন অবস্থায় যে অভিজ্ঞতা তারই স্মৃতিচারণ। এত অসুস্থতার মধ্যেও প্রেম তাঁকে সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে গেছে। তাই কবির কলমে উঠে এসেছে:

"একটা কচি বিড়াল থেমে ডাকছে

ওর ডাকে আমার ঘুম ভাঙেনি যদিও

ঠিক টের পেয়েছে আমি জেগেছি

.....

যদি সেসময় আশেপাশের কোনো ব্যালকনি থেকে কোনো পঞ্চাশোধ্ব প্রেমিকের চোখ আগ্রহী হয়ে ওঠে কীভাবে যুক্ত হবে ভাষার সংকেত!'

'অরুণ, বন্ধু তুমি তো সহকর্মী নও শুধু, তুমি সহমর্মী

আমি প্রেম খুঁজে নেব পঞ্চাশোর্ধ্ব সব যুবকের চোখে

জীবন হবে নতুন একেবারে এই কঠিনতম সময়ে।'

(জীবন যার নাম, পৃ. ২৮)

মারণ রোগ ক্যানসারে যিনি ভুগছেন, সেই কবির মধ্যেও প্রেমের কী দারুণ প্রত্যাশা, কী চাহিদা। আবার কখনও দীপিকা হাসপাতালের বেডে প্রেমের আভাস পান, কোনো এক বৃদ্ধের কাছে। যে বৃদ্ধ শীতের রাতে কবিকে আচমকা মাঝরাতে ভাঙিয়ে দেন। কবি নিজেকে 'তরুণ বৃদ্ধা' বলছেন। তারপর কবির বয়ানঃ—

'আমাকে জাগাতে চায় কোন এক বৃদ্ধ যুবক

আমাকে ঠায় বসিয়ে রাখতে চায়

মোহময় রাতের ভাষায়

সত্য কর্কট আরোগ্য আমার গলা

.....

আমাকে হাঁটি হাঁটি পা পা প্রেম শেখায়

দৌড়ে আমি এক যুবক বৃদ্ধের সঙ্গে

.....

কৃষ্ণ রুক্মিণী আমার আদর্শ হয়ে ওঠে

আমি লীলাবতী মেঘের মতো আকাশ জুড়ে দুটি'

(তদেব, পৃ. ৩০)

কখনও আবার এই প্রেমিক কবি নিজে তাঁর বন্ধুকে অবসর বিনোদনের জন্য ডাকেন এভাবে—

বন্ধু এসো, আমাকে দিয়ে যাও গল্প-অবসর

দিয়ে যাও সূর্য—অস্তাচল, অন্ধকার রাত

আর নির্জন বাসর

.....

আরও অজাগতিক অন্য এক মোহময়তার মধ্যে

মাঝে মাঝে এক মোহন বাঁশির শব্দ হতে থাকে

.....

অমূল্য দানে পেয়েছি এই জীবন

গল্পে গল্পে আনন্দে কোলাহলে, করো অমৃত মন্থন। এভাবে ব্রহ্মপুত্র পারের কবি দীপিকা বিশ্বাস তাঁর কবিতায় প্রেমকে বুনে যান এখন পর্যন্ত।

অন্যদিকে বরাক দুহিতা মেধাবী স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্যের[৫৪] কবিতায় কান পাতলে ধ্বনিত হয়— 'শব্দ আর/শব্দের শবের ওপর শুয়ে আছে কবি/নির্মোহ, বীতশোক/তার নিজেকে ভাঙা শেষ/তার নিজেকে গড়া অসম্ভব।' তাঁর নির্ভেদ লেখায় অনিবার্য, অমোঘ ঝড় স্পষ্ট উঠে আসে জননীর মাঝে মানবী সত্তাটি বড় সুন্দর তুলে আনেন স্বর্ণালী—

'তবু নিশ্চয় জানি/সিদুঁর টিপের কাছে

ত্রিনয়ন লুকানো রয়েছে/আসলে ঈশ্বরী তুমি

ভালোবেসে হয়েছো জননী।'

(বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৬৩)

কবি স্বর্ণালীর রোমান্টিসিজম ছুঁয়ে শুনি

'রাত্রির উপকূলে/জ্যেৎস্নার রূপালি বন্দর

বিছানা তাহাজ থেকে দেখা যায়/নীল সমুদ্দুর

সমস্ত আকাশ জুড়ে/মোহনায় আমাকে তোমাতে

একটি দীঘল সেতু/গড়া যায়, অন্তহীন রাতে'

(তদেব, পৃ. ৩৬৩)

আবার কখনও কবির কলমে উঠে আসে

'সহজ ব্যঞ্জনে তুমি

হলুদের বর্ণ নিয়ে আসে

পরিচিত রান্নাঘরে

.....

তোমার লাবণ্যে সখি

সাদা ভাত বর্ণ পায়

অন্ধ ঘর আলো হয়ে হাসে।'

স্বর্ণালী ফিছুটা জীবনানন্দীয় ঢঙে কবিতার নাম রাখেন 'সুজাতা'। আর কবিতার আঙ্গিকে বোধিবৃক্ষের প্রসঙ্গ উঠে আসে। এভাবে—

সহজ আঙুলে ধরা পাত্র ভরা পরমান্ন দেখে

তথাগত হয়ে গেলে তুমি

—মিষ্টি এক প্রেমিকার কথা।

তারপর,

এবার বৃষ্টি হোক, ঝরে পড়া বোধিবৃক্ষ-থেকে

.....

কোনো এক সম্প্রতা আচ্ছন্ন করেছে ভূমি

ঐ ভোর হয়।

— এখানে জীবনানন্দের স্বাদ প্রায় পুরোটাই উঠে এসেছে।

আবার সুজাতা (২) —এ সুরঞ্জনা বা সুচেতনার মতো সুজাতা নামটাই উঠে আসে। 'কার্তিকের রাত', নবান্নের ভাত'—এই সমস্ত শব্দগুলোই জীবনানন্দের কবিতায় ফুটে উঠে এসেছে। কবি লিখছেন—

"আকাশের গাল বেয়ে

ক্ষমার মতন বৃষ্টি ঝরে

.....

সুজাতা আগামী জন্মে

আমি হবো কার্তিকের রাত

.....

তুমি হয়ো

নবান্নের ভাত।”

(সুজাতা—২)

কখনও বা কবি স্বর্ণালী আবার সরাসরি ‘অভিসার’ নাম দিয়েই কবিতা লিখছেন—

আজ যাবো না নদীর কাছে

আজ যাবো না জলে

আমি কেবল বৃষ্টি ধারা

ছুঁইয়েছি দুই গালে।

.....

আগল খুলে বাইরে এলাম

চোখ ডুবে যায় ঘাসে

আমি কেবল মধ্যাচারী

ঘরে ও সন্ন্যাসে

.....

কোথায় আমার মাধুকরী?

কোথায় আমার ঘর?

আবার স্বর্ণালী লিখেছেন ‘বর্ষামঙ্গল’। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের[৫৫] একটি কবিতার নাম ‘বর্ষামঙ্গল’। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘বর্ষামঙ্গল’ আর স্বর্ণালীর বর্ষামঙ্গলে কোনো মিল নেই। স্বর্ণালী লিখছেন এভাবে—

লিখবো বর্ষার কাব্য, আমার গর্ভের মাঝে

হলো যার চেতনা সঞ্চার,

লিখবো বর্ষার কথা, আমার অশ্রুর মাঝে

ছিলো যার জন্মগত ভ্রূণ

.....

.....

লিখবো বর্ষার কথা, অসহ্যচুম্বনে যার

দগ্ধ হয়ে অদ্যাবধি।

স্বর্ণলীর ‘হসপিটাল’ কবিতায় প্রেমিক পুরুষের কাছে তাঁর অসুখ শুষে নেওয়ার কায়দাটাও মন কাড়ে পাঠকের।

'একটি চুম্বনে তুমি শুষে নাও সকল অসুখ

এ ঠোঁট ক্লান্ত আজ তিক্ত স্বাদ অ্যান্টিবায়োটিক

জড় ও বিষন্ন বড় রক্তালা সঙ্গীহীন একা—

তোমার দুঠোঁট যদি সঙ্গী হয় আজ দ্বিপ্রহরে

হয়তো সে ফিরে পাবে তার রং, মেলে দেবে পাখা...'

(অ-কবিতা, পৃ. ২৭)

স্বর্ণালী মানুষী প্রেম থেকে কখনও আবার তাঁর কলম ফিরিয়েছে 'পূর্বরাগ'— এর দিকে। আমরা জানি। পূর্বরাগ' 'বৈষ্ণব পদাবলীর'-র একটি অন্যতম পর্যায়। তবে স্বর্ণালীর পূর্বরাগ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে প্রেমের সঙ্গে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতাও দেখা যায়। স্বর্ণালী 'পূর্বরাগ' লামের কবিতায় লিখছেন—

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে মেঘ ভেসে এল

শিলং পাহাড়ে,

ওই মেঘ চন্দ্রাবলী, ওই মেঘ বিশাখা-ললিতা

.....

তাই ঝমঝম বৃষ্টি বুঝি নামে

লাবান বাজারে।

আর এক ভীরু মেঘ আর এক ধবল কিশোরী

আজ তার অভিসার

.....

শিলং পাহাড়ে আজ পূর্বরাগ অভিনীত হবে।

বরাকের জনপ্রিয় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। বাস্তবমুখী হয়েও অসাধারণ রোমান্টিক। প্রেমের প্রভাব থেকে তিনিও মুক্তি পাননি। তাঁর কবিতায় কান পাতলে শুনি—

তুমি আমার ঘুম ভাঙা তোর বাউল কণ্ঠে 'রাই জাগো' গান তুমি আমার খয়রাতী দান রেশন-চালের পাথর কুচি দূর বিদেশে তুমি আমার খাল পেরোতে ভাঙা সাঁকো তুমি আমার ঘুষঘুষে জ্বর নতুন জুতোর দুঃখ ও সুখ ওপর আলোর খুশি মেজাজ তুমি আমার তুমি তুমি আমার। জীবনকে এমন করে দেখার এই বিপ্রতীপ প্রয়াস বরাক উপত্যকায় একেবারেই নূতন আর এই নূতনত্বে জড়িয়ে থাকা তির্যক বাচন ভঙ্গিও আধুনিক। তাঁর ছন্দজ্ঞান অপরিসীম।

'অতন্দ্র'[৫৬] থেকে তাঁর জয়যাত্রা শুরু, ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত এ উপত্যকার ছোট পত্রপত্রিকায় শক্তিপদ ব্রহ্মচারী কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীয় 'মনসামঙ্গল' কবিতাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বরাক উপত্যকা এবং বহির্বঙ্গেও। লোকায়ত জীবনের ঐতিহ্য নিয়ে।

'মনসামঙ্গল'-এ কবি লিখেছেন 'কুপি লম্পে রাতকানা নিরক্ষর বুড়ি'র মানবিক করুণ ছবি

'সপ্তডিঙা মধুকর চারদিকে জল
শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসা মঙ্গল
পচাপাটে এদো ডোবা বিষধর ফণা
ছেঁড়া কাঁথা-কানি আর বেহুলা যন্ত্রণা
হু হু করা কাল সন্ধ্যা ভেসে আসা গানে
গায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে'

কবির আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেমের কবিতা হল 'মা বলতে পারতেন।' এখানে কবি প্রেমের এক অব্যক্ত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তিনি শুধু প্রেম নয়, মায়ের মমতাকেও এক সঙ্গে প্রকাশিত করেছেন। তাই বলে এখানে মার তার সন্তানের প্রতিমে প্রেম তা বিন্দুমাত্র লোপ পায়নি। তাই কবি বলছেন—

'ছাঁই-পাশ লিখে যাস, মানুষের কী যে কাজে লাগে
বুঝি না কিছুই, দেখি কলমের শিস মুখে, আর
মাঝে মাঝে বিড়বিড় করিস
.....
আমার বুকের দুধে তোর মুখ বার বার ধুয়ে দেবো আয়।'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৬৪)

সময়টা ষাটের দশক। কবিদের ঘিরে ছিলো অস্থিরতা সেই সময়। মেধা বা মনন জীবনসত্য খুঁজতে আঞ্চলিকতা ডিঙিয়ে তখন উড়াল পাখি বৃহত্তর বাংলা কাব্য ও সাহিত্য আকাশে।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব না দিয়ে মূলস্রোতে বয়ে যাওয়ার জন্য হৃদয় ও কলম তীব্র তৃষায় কাজ করে চলেছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় অতন্দ্রকে কেন্দ্র করেই তখন এক কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এছাড়া শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি থেকে প্রচুর ছোট পত্রিকা ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিলো— তাদের কেউ কেউ দীর্ঘজীবী বা ক্ষণজীবী হলেও কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতে জেগে থাকলো সময় ও জীবনের মূল্যবান গাথা। বলা যায় এই সব ছোট পত্রিকা সময়ের এক মূল্যবান দলিলও বটে। এই সকল কবিদের মধ্যে কেউ কেউ বাস্তবজীবনের চূড়ান্ত চাহিদায় পা বাড়িয়েছেন দূরদেশে, ক্রমশ সেই সব নাগরিক জীবন ও ক্ষেত্রে ছড়িয়ে গেছে তাঁদের শেকড় পরবর্তী পর্যায়ে আসেন আলোকিত লুণ্ঠন জ্বালিয়ে কাব্যলক্ষ্মীর আরও সন্তানসন্ততি। 'কবি বংশে'র বুদ্ধি ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম একজন অমিতাভ দেবচৌধুরী।

অমিতাভ প্রেমের কবিতা ঠিক সে অর্থে লেখেননি। কিন্তু কবিতায় প্রেম একেবারেই থাকবো না তা কী করেই বা সম্ভব? কবির অজান্তেই হয়তো প্রেম এসে কবিতায় একাকার হয়ে যায়। তবে প্রেমের কবিতাই লিখবো। এমন কোনো শর্ত মাথায় নিয়ে অন্তত অমিতাভ কবিতা লেখেননি বললে হয়তো ভুল হবে না।

অমিতাভ লেখেন—

যত কথা বলি আর যত কথা লিখি

সেসব কথারা যদি হারিয়ে সকল অর্থ

.....

.....

'প্রিয়'।

যে কথা বলিনি কোনোদিন যে কথা লিখি

.....

.....

যদি তুমি নেচে ওঠে গানের সে

দূরভিসন্ধিতে

এইটুকু অভিপ্রায়।—

(ঘুঙুর)

কবি ঘুঙুরের কথা বলতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কোনো কাউকে আকাঙক্ষা করছেন সেই ঘুঙুরের অধিকারী হওয়ার।

আবার যখন সেলুনে 'রবীন্দ্রগীতি' কবি লেখেন—তখন রবীন্দ্রগীতির প্রসঙ্গে সখি বা বসন্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। যা কি না প্রেমেরই অনুষঙ্গ। কবি লিখছেন—

"সেলুনে শুনেছি গান, অকস্মাৎ রেডিওর

বিষয় গলায়

চলে যায়, চলে যায় বসন্তের দিন চলে

যায়... কী গান শোনালে সখি, আয়নায় স্তব্ধ হয়ে দেখি

.....

অনন্ত বসন্তদিন, আমি গান হয়ে যাই

সেলুনের একা আয়নায়।"

'মৈষাল' কবিতায় কবি মূলত স্থানিকতার সঙ্গে প্রেমকে এনেছেন।

— গান শুনে চোখে জল আসে

মনে পড়ে, বহুজন্ম আগে আমি মৈষাল ছিলাম।

.....

আমি নারীদের কাম

.....

গোয়ালপাড়ার থেকে ফিরে আসি গহন আসাম।

একজন নারী শুধু আমার আগুন

দিয়েছিল একাকী নিভিয়ে,

বলেছিল, সম্ভোগের চেয়ে মুখোমুখি বসে থাকা

ঢের বেশি দামি।

.....

এজন্মে হে সুন্দরী, তোমার শহর জুড়ে

ফেরি করি সুরের গ্রাম।

আবার নিছক প্রেমই ফুটে উঠেছে এমন কবিতাও রয়েছে অমিতাভের হাতে।

তোমার বাড়ির আপন ভোলা রোদ

আমার ঘরের দাওয়ায় আসতো না

বাড়ি দুটির মাঝখানে যে ছিল

গাছের বেড়া, ছায়ার আস্তানা।

.....

রোদ হয়েছে সেলাই— তা তো ঠিক

ছায়ার এখন কমছে আনাগোনা।

রোদ আসে আজ। কিন্তু তোমার দূত

একলা শালিখ, সে আর আসে না।

আমরা জানি এক সময় পায়রা চিঠি আদান-প্রদান করতো। কাজেই তাকে দূত বলা হয়। কিন্তু কবি অনেকটা যেন জীবনানন্দীয় ঢঙে শালিখ কে তাঁর প্রেমিকার দূত বলেছেন অবলীলাক্রমে।

আবার কখনও খুব ছোট্ট করে আদান-প্রদানের কথা লেখেন কবি এভাবে—

সাজানো বাগান সব কথা ভুলে গেলে

মরুভূমি কিছু কিছু কথা তুলে নেয়

পড়ে থাকে শুধু চাষ আমাদের কথা

আদান-প্রদান এভাবেই শেষ হয়।

এভাবেই অমিতাভ দেবচৌধুরির কবিতায় প্রেম খেলা করে যায়। বস্তুত ব্রহ্মপুত্র বা বরাক কিংবা পৃথিবীর যে কোনো স্থানের কবিতাই হোক না কেন প্রেম স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবির কলমে উঠে আসে।

জীবনানন্দের ভাষায় 'সকলেই' কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। আর যাঁরা যথার্থ অর্থে কবি তাঁরা প্রেমিক না হয়ে কবিতা লিখতে পারেন না। তবে হ্যাঁ কেউ একেবারে রগ্‌রগে্ প্রেম কিংবা যৌনতার কবিতাও লেখেন, তবে আমরা সে আলোচনায় যাব না। আমাদের আলোচ্য বিষয় অসমের, বাংলা কবিতায় প্রেম। সেটাতে ব্রহ্মপুত্র ও বরাক দুই উপত্যকায় সমান কৃতিত্ব দাবী করে বলে মনে হয়।

অসমের বাংলা কবিতায় স্থানিকতায় উদাহরণ প্রচুর। প্রায় সব কবিই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে তুলে এনেছেন কবিতায়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস থেকে শুরু করে আজকের অর্জুন দাস[৫৭]— সবাই কোনো না কোনো স্থান নাম ব্যবহার করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি কবিতায় পাই—

উমখ্রা নদীর ঝিরঝির

নুড়ির তালে তাল রেখে।

আবার সঞ্জয় চক্রবর্তী লিখছেন—

'আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতী প্রসাদের গীত

আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতীপ্রসাদের গীত

তুমিও তেমনি। হঠাৎ কখনও, শুনে নিও রবীন্দ্রসঙ্গীত।'

(উৎসবের টেবিল, পৃ. ২১)

প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব কবির মধ্যেই স্থানিকতার উদাহরণ বিদ্যমান। এঁরা যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবি, এই সত্য কখনো ভুলতে পারেননি। হয়তো সেজন্যেই এঁদের কবিতায় অন্য স্বাদ, অন্য গন্ধ, অন্য রূপ তার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে উঠে এসেছে। অমলেন্দু গুহর একটি কবিতা যেমন—

'দৃঢ় ঊরু মেয়েদের পদপাতে নেচে ওঠে ঢেঁকি

.....

অনেক কপৌফুল গুঁজেছি খোঁপায় তোর সই!'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৪৬)

এই কবিতায় নাম 'বিহু', যা অসমের সবচেয়ে বড় উৎসব। বসন্তকালে কপৌফুল অসমের প্রকৃতিকে রঙিন করে তোলে। এই এভাবেই কবিতায় স্থানিকতা ফুটে ওঠে।

মানিক দাস[৫৮] লিখেছেন, '... উদ্বাস্তু মানসিকতা আর পারিপার্শ্বিক চাপজনিত অবদমন বাঙালি চেতনাকে কাবু করে রেখেছিল বা রেখেছে। এর ফলে যা কাজ হয়েছে মূলত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে। আত্মপ্রকাশের প্রবল তাগিদেই এক একজন বাধ্য হয়েছেন কাগজ করতে। লিখতে। লেখা জোগাড় করতে। বেঁচে থাকাকে অর্থময়তা দিতে।

'... সেজন্য তাঁদের প্রত্যেকের উদ্যোগ, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, কুর্নিশযোগ্য।'

(বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৬৭)

দেশভাগের আগে প্রতিষ্ঠিত পরিবারের বাঙালি অসমিয়া যুবকেরা পড়াশোনা করতে যেতেন কলকাতায়।

এখনও যান তবে কলকাতায় নয়, বাঙ্গালোর-দিল্লিতে। অসমের বিখ্যাত সন্তান লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া[৫৯] কলকাতায় গিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সংস্পর্শে আসেন এবং তার আচার-সংস্কৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সেই পরিবারের মেয়েকেই তিনি বিয়ে করেছিলেন। 'সাহিত্যরথী'[৬০] লক্ষ্মীনাথের হাত ধরে অসমিয়া ভিটে মাটি', লুইতের গতিবেগ' প্রভৃতি শব্দ। আর অমন্দে নিজের অবস্থান চূড়ান্ত করে দেন 'শান্তির নিবিড় নীড় আমার আসাম' লিখে।

বরাকের অন্যতম শক্তিমান কবি অশোকবিজয় রাহা[৬১] যিনি প্রাক্ স্বাধীনতা কাল থেকেই কবিতা নিয়ে চলেছেন। তাঁর একটি কবিতার নামই 'ডিহাং নদীর বাঁকে'— মনে রাখতে হবে 'ডিহাং' নদীটি অসমের একটি অন্যতম নদী। এই ডিহাং শব্দটি ব্যবহার করে কবি বুঝিয়ে দিলেন যে কবিতার কোনো স্থান বিভাজন হয় না। কোনো না কোনো ভাবে কবির লেখায় নিখের ঠাঁই ছাড়াও অন্য প্রান্তের কথা কবির অজান্তেই হয়তো চলে আসে। কবি কবিতাটিতে এভাবে লিখেছেন।

"একটি রাতের একটু দেওয়া নেওয়া
এই তো হল শেষ,
আজ সকালে পাহাড়-দেশের মেয়ে,
ছাড়ব তোমার দেশ।
মনের মাঝে ঘরছাড়া কেউ আছে,
চিনিনে কেউ তাকে,
যাবার বেলা বিদায় বলে যাব
ডিহাং নদীর বাঁকে।
.....
কোথায় ছিল সবুজ বনের তলে
ওই আগুনের শিখা—
জিহ্বা মেলে হাজার বছর ধরে
তৃষ্ণার মরীচিকা?
ওই আগুনে পড়ছি তোমার মুখে
তারই অনল-গীতা,
জ্বলছে তোমার সর্ব দেহে বুকে
সর্বনাশের চিতা!

সাহিত্য-সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হয়েছিল একথা অবশ্য স্বীকার্য।

ঠিক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার মতো লুইত পার থেকে গত শতাব্দীর চারের দশকে কলকাতায় পড়তে

যান অমলেন্দু গুহ। জন্মেছিলেন মণিপুরের ইম্ফল শহরে ১৯২৪ সালে। ১৯৩৯-এ গুয়াহাটিতে দুটি মার্কসবাদী পাঠচক্র ছিল। অমলেন্দু আকর্ষিত হয়েছিলেন তৎকালীন বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সৌমেন ঠাকুরের[৬২]।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন অমলেন্দু। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা করার সময় অমলেন্দু বিভিন্ন বামপন্থী তাত্ত্বিক ও কবির সান্নিধ্যে আসেন। এঁদের উল্লেখযোগ্য রাম বসু।[৬৩] এবং নিজেও কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর কবিতা তখন প্রকাশিত হয়েছে 'নতুন সাহিত্য', 'অরণি'[৬৪], 'পরিচয়'[৬৫]-এর মতো নামী পত্রিকায়। কলকাতায় ছাত্রাবস্থাতেই অমলেন্দুর অতি বিখ্যাত 'ট্রাম' কবিতাটি একটি পুস্তিকাতে স্থান পায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ-জীবনে অমলেন্দুর লেখা কবিতাগুলি নিয়ে 'লুইত পারের গাথা'[৬৬] বইটি ছেপেছিল কলকাতায় নতুন সাহিত্য ভবন। সেটা ১৯৫৫। এর আগে ১৯৪০ সালে কবি বিহারী সিনহার 'গীতমঞ্জরী' প্রকাশিত হয় গুয়াহাটি থেকে।

লুইত পারের প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থের মালিক অমলেন্দু গুহ। বইটির নামের মধ্যেও জড়িয়ে রয়েছে অসমের এক প্রধান নদীর নাম। লুইত শব্দের অর্থ ব্রহ্মপুত্র। নামকবিতায় পাওয়া যাচ্ছে লুইত, শিপিনী, রিহামেখলা, বহাগী, নাহর, ভৈয়াম, কপৌ-এর মতো শব্দ। এসবের মানে সাধারণ বাঙালি পাঠকের বোঝার কথা নয়। কিন্তু অমলেন্দু এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন একেবারে জলবৎ তরলং ঢংয়ে। প্রকৃতপক্ষে অমলেন্দু প্রথম থেকেই লুইত পারের গন্ধ-রস-সংস্কৃতি শুষে নিয়েছেন, তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় এই কবি কোন অঞ্চলের।

এখানে স্বপ্নের মতো আমার সত্তার সাথে/জড়ানো ছড়ানো এর দেশ/আমি ভালোবাসি তার বনরাজিনীল পরিবেশ।/কমলার কুঞ্জে কুঞ্জে রসলুব্ধ মৌমাছির ভিড়/...কখনও বা প্রথম বৈশাখে/শিপিনী কুমারী সাজে আনকোরা রিহামেখলায়।

(লুইত পারের গাথা)

স্বপ্নের মতো সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে, ছড়িয়ে থাকে বনরাজিনীল লুইত পারের পরিবেশ। র বৈশাখ বাংলার মতো অসমিয়াতেও নববর্ষ। নববর্ষে বস্ত্র পরার বিষয়টি রয়েছে— আনকোরা রিহামেখলায়। একটু পরেই এই কবিতায় যায় 'বহাগীর আমন্ত্রণ', 'কলঙের জলোচ্ছাস', 'জুমখেত', 'জুমখেত', 'ভৈয়ামের অস্বস্তিকর দশক ভাগের প্রবণতা থেকে বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে ষাটের দশকে রাখা যায়। যদিও তাঁর কাব্যচর্চার শুরু পঞ্চাশের দশকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পরবাসী'[৬৭] প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯-এ। প্রথম থেকেই বীরেন্দ্রনাথ কবিতা লেখার নিজস্ব স্টাইল নির্মাণ করেছেন। এই কবির পরবর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থ হলো— সাক্ষাৎকার, একা যাবে ও ৩২ যোগিনী বসিবেক।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত আদতে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে এই লুইত পারে আসেন। উপরে উল্লিখিত তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যের একটা অন্য ধারা দেখতে পাওয়া গেলেও এই অঞ্চলে বসবাস করার ফলে স্থানিকতার বৈশিষ্ট্য থেকে তিনিও বাদ পড়েননি। তাঁর 'চিঠি' নামের একটি কবিতা যা 'এই আলো হাওয়া রোদ্দুর নামে নামে কবিতা সংকলনে প্রকাশিত হয়, সেখানে সরাসরি ফুটে উঠেছে এই উত্তর পূর্বের স্থান নাম। তিনি লিখেছেন

'চেরাপুঞ্জি থেকে ভায়া শিলং-অবিশ্বাস্য আঁচলের খুঁটে

পাঠাও যে মেঘ, তার পাঁচ হাজার ফুট নিচে-জল

প'ড়ে আছে বাংলাভাষায়।'

আবার 'নাইন্‌থ কলাম'[৬৮]-এর উদ্যোগে প্রকাশিত 'উত্তরপূর্বের বাংলা কবিতা নামক কবিতা সংকলনে ধরেন রক্ষিত লিখেছেন—

'নদীতে কী উপলক্ষে শরাইঘাটের জলরঙ

ছবিতে আগুন লাগে—

.....

চোখের আরামও সেই নৌকো বাঁধা আছে। (তদেব, পৃ. ৫৯)

— কবিতাটির নাম 'শরাইঘাট ব্রিজ থেকে'

এভাবেই বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত তাঁর নিজস্ব ছন্দনৈপ্যু, যতিচিহ্ন, বিশেষণ, ইমেজ, স্থানিকতা ও স্বকীয়তা নিয়ে থেকে যাবেন অম্লান।

স্বাধীনতা উত্তর কালে অমলেন্দু গুহ একা যে ধারার মশাল বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার সার্থক উত্তরসূরি হলেন ঊর্ধ্বেন্দু দাশ। ষাটের দশকে উজান অসম থেকে দুটি ছোটো পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন তিনি। সংবর্ত ও মজলিস-এ বহু তরুণ কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত ঊর্ধ্বেন্দুকে ঘিরেই ওইসময় ডিব্রুগড় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ গতি পেয়েছিল। অসমে যাঁরা এতদিন ধরে কবিতা লিখেছেন, ঊর্ধ্বেন্দু অন্যতম সেরা। 'বিষণ্ণ পরবাস, নির্বাসন নয়'[৬৯], 'ঘরে তার ফেরা বা না-ফেরা'[৭০] ও 'এই লজ্জা তোমার আমার'[৭১] কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর।

আবার বরাকের অন্যতম কবি রামেন্দ্র দেশমুখ্য তাঁর 'প্রেমিকা শহর' কবিতায় জীবনানন্দের[৭২] শ্রাবন্তী বিদিশা থেকে তাঁর নিজের শহর, তাঁর আপন জায়গা শিলচরকে আরো মনোরম বলেছেন।

'শ্রাবস্তী বিদিশা থেকে শিলচর শহর

আরো মনোরমা,

গ্রীবাময় মালোপমা, শ্যামশ্রী শরীর,

মোহিনী বরাককণ্ঠী ষোড়শীর বেশে

দেশে দেশে খুঁজছে আমাকে!

.....

সেই দুটি ঘন চক্ষু, অনমিত পল্লবে নিবিড়

পারাপারহীন প্রেমে মহামৌন সবুজ শহর,

শ্রীমতী পূর্ণিমা এসে মুগ্ধ চোখে বলে,

স্তব্ধ এই জন্ম জন্মান্তরে

আজ রাতে বক্ষে বাঁধো প্রেমিকা শহর।' (তদেব, পৃ. ৩৮)

চুম্বকে ঊর্ধ্বেন্দুকে ধরতে হলে বলা যায়, সমাজমনস্ক কবি নানাসময়ে জীবনের নানা অনুভবের কথা লিখেছেন। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, বস্তুনিষ্ঠ মানসিকতা বা সমাজের ওপর লুব্ধ বিক্ষোভ দেখা যায় তাঁর কবিতায়। আর নাগরিক জীবনের অবিস্বাদিত বা সমাজের ওপর ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ দেখা যায় তাঁর কবিতায়। আর নাগরিক জীবনের অবিসম্বাদিত ক্লান্তি কবিকে করেছে একাকী অন্ধকারের যাত্রী। ঊর্ধ্বেন্দুর 'সাকিন আসাম, ১৯৮৩' ইতমধ্যেই ইতিহাসে পা রেখেছে।

"ভগ্নস্তূপের মাঝে এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে"

আশি বছরের পোড়া রূপের দেমাক নিয়ে শুয়ে আছে আমার নানিমা খুব সচেতনভাবে ঠাকুমা নন, নানিমার উল্লেখ করেছেন কবি। কবিতার পটভূমি যে ওই উত্তাল সময়।

হন্তারক মানুষের জান্তব পদচ্ছাপ বুকে নিয়ে শস্যহীন বসন্তের মাঠ,

রক্তাক্ত পাঁকে দেখো মুখ গুঁজে পড়ে আছে আমার হানিফ চাচা,.....

খোদার মসজিদ আর ঈশ্বরের নমিঘর, মাঝে শতাব্দীর টাকা অন্ধকার পথ,

পথের দুধারে ছিন্ন শিশুর শরীর, ভিন্ন

প্রৌঢ়ের শির, দীর্ণ জননীর যুগল উরোজ।

ওদিকে ভরলি আর এধারে কলঙসুতি, কপিলি, দিখৌ

লুইতের পার ধরে জলের উজানে যাও, জলের ভাটায় দাও শ্মশান-শ্মশান

ষাটের দশকে ঊর্ধ্বেন্দু দাশের সঙ্গে ডিব্রুগড়ে সাহিত্যচর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্ষিতীশ রায়[৭৩]। ডিব্রুগড়ের একটি কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন তিনি। তাঁর একক কোনও কাব্যগ্রন্থ নেই। তাঁর ও অসিত দত্তের[৭৪] যুগ্ম কাব্যগ্রন্থ 'দ্বৈত'[৭৫]। এই কবি অবশ্য ঊর্ধ্বেন্দু দাসের সম্পাদনায় 'সংবর্ত' পত্রিকায় অনেক লিখেছেন। একসময় তিনি নিজেও 'সংবর্ত'[৭৬] সম্পাদনা করেছেন। সেখানে ক্ষিতীশ রায়ের কবিতা পাওয়া যায়। 'উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' সংকলনে কিন্তু ক্ষিতীশের বেশ কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে। যুগ্মভাবে 'সংবর্ত' সম্পাদনার পর তিনি একক সম্পাদনায় বের করেন 'সাংস্কৃতিকী'[৭৭]।

অন্যদিকে বরাকের আরেক অন্যতম শক্তিমান কবি দিলীপকান্তি লস্কর অসম আন্দোলনের এই ভয়াবহতা থেকে নিজের কলমকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। এই সংগ্রামের সংঘতি বরাক পারের কবির মর্ম মূলকেও নাড়া দিয়েছিলো। অসম আন্দোলনের বেশ যদিও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, বরাক উপত্যকা তেমনি ভাবে আন্দোলিত হয়নি এই রেশে তবুও কবির মানস চক্ষু এই স্থানকে বৈধ ভূমি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং তিনি সরাসরি কবিতাটির নাম দিয়েছেন 'বৈধ তুমি আসাম'। কবিতাটির শুরুতেই দেখা যাচ্ছে আসামের চর্তুদিকে এক ঘন নৈঃশব্দ্য। দুয়ারের কড়া নাড়লেও কেউ ভয়ে দুয়ার খুলছে না। একবার কবির মনে হয়েছে হয়তো সকলেই বাইরে কোথাও গেছে। নয়তো সম্পূর্ণ পাড়া খালি

কেন? তার পরই কবির মনে হয়েছে, ভিত সন্ত্রস্ত অসমের সেই মানুষের কথা যারা হয়তো বা বাইরে তালা ঝুলিয়ে নিঃশব্দে বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে আছে। তার পরই কবি বলছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতকে এইভাবে—

"ও পাড়ার শব্দেরা পাষাণ

কান্নারা পাথর হয়ে জমে

প্রহরেরা তুষারের মতো

ঠান্ডা ও নিঃশ্চুপ ঝড়ে পড়ে!

জমে হয় কাঠ

বাতাসে বারুদগন্ধ

নাশের নিঃশ্বাস।"

বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় স্থান পাওয়ার কথা ভেবে ইদানীংকালে অসমের কিছু বাঙালি যুবক সচেতনভাবে কবিতা গল্পে লুইত পারের কথা লেখেন না। কিন্তু সমাজসচেতন ক্ষিতীশ সেই জলে ডুব দেননি। তাঁর 'নতুন মাতৃভূমি' কবিতা সেই ষাটের দশকেই যাকে বলে 'হিট'। এবং এখনও এই কবিতার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না।

'নতুন মাতৃভূমি' নামেই কবিতার ভাববস্তু পরিস্ফুট। শুধু বাংলাদেশ নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকেও প্রচুর বাঙালি এসেছেন অসমে। এবং থেকে গেছেন। তাঁদের কাছেও এই অসম, ব্রহ্মপুত্র পার হলো নতুন মাতৃভূমি। এই কবি অবশ্য নিজেই স্বীকার করে নেন যে তাঁর জন্ম বাংলাদেশে। তিনি এসেছেন সেখান থেকেই—

পহার-ভৈয়াম হাতে হাত রেখে

যেখানে অনাদি কাল হতে

রয়েছে দাঁড়িয়ে

লক্ষ্য সমুখের দিকে—

ব্রহ্মপুত্র পারের বাঙালি কবিদের মধ্যে উর্ধ্বেন্দু দাশই প্রথম সচেতনভাবে সমমনস্কদের নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন, কবিতা লেখা, পত্রপত্রিকা সংগ্রহ, সাহিত্যের নতুন ফর্ম নিয়ে ভেবেছেন। তাঁর সেই সময়ের অবিচ্ছেদ্য কমরেড ছিলেন ক্ষিতীশ রায়।

ষাটের দশকে ডিব্রুগড়ে উর্ধ্বেন্দু দাশ যেমন কাব্যচর্চায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঠিক তেমনই নগাঁওয়ে বসে একমনে কবিতা লিখেছেন জীবন নাথ[৭৮]। অমলেন্দুর বাংলা কবিতারই একটিই, কিন্তু জীবন নাথ বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর 'শাশ্বতী সমা'[৭৯], 'মা নিষাদ'[৮০], 'পুষ্পমোচনের উদ্ভিন্ন রাগে'[৮১], 'স্বগত'-র বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি এখনও প্রবীণদের মুখে শোনা যায়। ব্রহ্মপুত্রপারের জন মাটি-বাতাস তাঁকে কতটা শুষে নিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিনের নাম 'ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা'[৮২]-র মধ্যে।

আবার, বরাক পারের কবি মনোতোষ চক্রবর্তী ভূবন পাহাড়কে নিয়ে দুটো কবিতা লিখেছেন যার প্রথমটিতে ভূবনপাহাড়ে সূর্যোদয়ের অম্লান ছবি ফুটে উঠেছে, এবং সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে কবির বাল্য জীবনের ছবি। আর দ্বিতীয়টিতে, একেবারে সরাসরি বরাক নদী ও শিলচরের কথা ফুটে উঠেছে। কবির প্রথম কবিতাটির নাম 'ভুবন পাহাড়ে সূর্যোদয়' ও দ্বিতীয় কবিতাটির নাম 'দর্পণ'।

প্রথম কবিতাটি 'ভুবন পাহাড়ে সূর্যোদয়' এ কবি লিখেছেন—

'ভুবন পাহাড়ে সূর্যোদয় : আমার বাল্যছবি
সেই ছবির ভিতরে আকাঙ্খার মেঘ আর বাদলঘন দিন
সেই ছবির ভিতরে পালা-পার্বণ, মাত্রাগান
মায়ের সাবিত্রীব্রত
সেই ছবির ভিতরে আমার নানান ব্যর্থতার নানারকমের রং
.....
প্রতিদিনের সূর্যোদয় আমাদের দারিদ্র্য ভোলানো উত্থান
ভুবন পাহাড়ে সূর্যোদয়'

(তদেব, পৃ. ১১৬)

দ্বিতীয় কবিতা 'দর্পণ' এ কবি লিখেছেন—

'ভুবন পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হবে আগামী বর্ষায়
শিলচরের কাছে দূরে গ্রামগুলি ভরে উঠবে সোনালি ফসলে
বরাক নদীতে খুব মাছ হবে, সস্তা মাছ উঠবে ফাটক বাজার
চৈত্রের কাপাসতুলো ভাসবে হাওয়ায় খুব সুখে ; এ বছরে
বন্ধ্যা নারী হবে পুত্রপ্রসবিনী।
.....
হঠাৎ সন্ন্যাসী এসে স্তোকবাক্যে তোমাকে ভোলায়
আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হল শিলচর শহরে।'

(তদেব, পৃ. ১১৭)

রমানাথ ভট্টাচার্য[৮৩] শিলংয়ে কাব্যচর্চা শুরু করলেও জীবনের একটা বড়ো সময় কাটিয়েছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিশেষ করে গুয়াহাটিতে। সম্পাদনা করেছেন কবিতা পত্রিকা 'শিলঙের কবিতা', 'পৃথিবী'[৮৪] তাঁর 'লৌকিক বৃত্তের ভিতর', 'এবং পৃথিবী' ও 'লুইতের পদাবলী'[৮৫] এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। নাইন্‌থ কলামের উদ্যোগে প্রকাশিত উত্তরপূর্বে বাংলা কবিতা নামক কবিতা সংকলনে রমানাথের 'লুইতের পদাবলী' সরাসরি স্থানিকতার ছবি ফুটে উঠেছে। রমানাথ লিখছেন—

'রাতের পাখি ডাকছে রকম কী রকম করছে
বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে হাড় ভেঙে যাচ্ছে প্রাণ উড়ে যাচ্ছে
কী এক বিষাদ ভয় কুরে-কুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে
মনে হচ্ছে এই বুঝি কে এসে নিয়েই যাবে
ভেসে যাবে ঘর-দোর হাওয়া হবে বাড়ি
.....
ঝড়, উন্মাদ ঝড় বুকে উঠে আসছে
কী রকম কী রকম কী রকম করছে।'

(তদেব, পৃ. ৮১)

কবিতা যে প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র— এই বোধ নিয়ে অসমে প্রথম কবিতা লেখেন সত্যেন চৌধুরী[৮৬]। মরিয়নির অধ্যাপক সত্যেন চৌধুরী বয়সে ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, ক্ষিতীশ রায়ের প্রায় সমসাময়িক। অসমিয়া কবি দুর্গা হাজরিকার সঙ্গে যৌথভাবে তিনি একটি কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করেন ১৯৭১ সালে। 'সাঁকো'[৮৭] নামক ওই পুস্তিকায় সত্যেনের কবিতা রয়েছে চোদ্দটি। এবং এ ছাড়া তাঁর আর কোনও কবিতা কোথাও চোখে পড়েনি। অনেকটা সময় সেনের মতোই কবিতা জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছেন এই কবি এরকমই বোধ হয়। অথচ সমকালীন সময়ে সত্যেন ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান অন্তত তাঁর কবিতা তো তাই বলছে। তাঁর প্রত্যেক কবিতাই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একেবারেই অপ্রচারিত এবং অনালোচিত এই কবি। কিছুটা বিস্ময়করও বটে।

ভোগদৈ ; তোমার রুপোলি খামে
আমি —
আমার মায়ের চিঠি পাই।
নিশুতি রাতে—
যুদ্ধ যখন থেমে যায়
পরাজিত সৈনিক
বিপক্ষে দলের শিবিরে বন্দী
তখন—
ভোগদৈ ; তোমার রুপোলি খামে
সোনালি চিঠি আসে।
আর —
সে চিঠিতে মুক্তির আনন্দ।

'মায়ের চিঠি' কবিতায় এই ভোগদৈ উজান অসমের একটি নদী।

দেশ বিভাজন যে কবির জীবনে নিয়ে এসেছিলো জীবন, না ক্রমশ শেকড় ছড়ায়, সেই কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য। কবিতা সুন্দরীর কাছে নিরলস ছিল তাঁর আত্মসমর্পণ।

পূর্বদিকে শাঁ শাঁ খোয়াইয়ের বান ডাকা জল

ডুবে গেছে মাঠ,

ঘোলা জলে চারিদিকে শাদা

গ্রামখানি ভেসে আছে জলের উপর

বোঝাই নোঙর করা জাহাজের মতো

বাঁ দিকে সড়ক।

অসমের ছোট্ট জনপদ খারুপেটিয়া থেকে প্রমোদরঞ্জন সাহা[৮৮] কবিতা লিখতে শুরু করেন খাটের দশকে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এই সময়ের ফসল। এবং তাঁর কবিতায় সার্থকভাবেই ফুটে উঠেছে অসমিয়া- বাঙালি দাঙ্গার মনন —

অসমের এখন রক্তধূঁলির ঝড়/কোন আকাশে উঠাবে রামধনু/

হে অনেকদিনের ঈশ্বর/বলো না গো জননী/গহপুর কোকরাঝাড়ে

ব্রহ্মপুত্র আছে কি নেই?

(তবু গ্রীষ্ম)

সত্যিই তখন অসমে ছিল রক্তধূলির ঝড়।

কবি হিসেবে অসমের বাঙালি পাঠক কুমার অজিত দত্তকে মনে রাখেননি। সাম্প্রতিক কালে তিনি বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন ছোটোগল্পের জন্য। কিন্তু গুয়াহাটির কবিতাচর্চা ও লিটল ম্যাগাজিনের ইতিহাস তৈরি করতে গেলে অজিত থাকবেন একেবারে প্রথম সারিতে হয়তো বা শীর্ষেই। 'মাটির ডানায় অশ্রু'-র দুবছর পরেই তিনি প্রকাশ করেন সম্পাদিত ছোটো পত্রিকা 'স্বরের আড়ালে শ্রুতি'[৮৯]। মজলিস, সংবর্ত প্রকাশ করে ঊর্ধ্বেন্দু দাশেরা যা করেছেন, একই কাজ গুয়াহাটিতে করেন অজিত দত্ত। অজিতের আরও বড়ো কাজ হলো প্রায় পাশাপাশি সময় 'উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা'[৯০] সংকলন সম্পাদনা। এই সংকলনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত কবি স্থান পেয়েছিলেন। আজও এটিকে উত্তর-পূর্বের বাংলা কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে আকরগ্রন্থ বলে ধরা হয়। অজিতের এই কর্মকাণ্ডই পরবর্তী পর্যায়ে উদয়ন বিশ্বাস সম্পাদিত 'একা এবং কয়েকজন'[৯১] বা সঞ্জয় চক্রবর্তীর 'মহাবাহু'[৯২] কিংবা দিলীপ দাসের 'মাজুলি'[৯৩] প্রমুখ ছোট্টো পত্রিকার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয় ও প্রেরণা জোগায়।

কিশোরের বিহু বদলে একটি কবিতা'-য় লুইতপারের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বিরাজমান।

মোষের শিঙের মতো তীব্র কাঁশর ডাক শুনি

পেঁপা[৯৪] নামে এক বাঁশি আছে যা মোষের শিং দিয়ে তৈরি হয়।

এই অনুভব অসমের বিশেষ ব্রহ্মপুত্রের পারের কবি ছাড়া সম্ভব নয়। আর কিশোরের ওই কবিতা তো এখন মিথ— হুররে আজ আসাম অ্যাকর্ড।

বরাকের জনপ্রিয় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী বাস্তবমুখী হয়েও রোমান্টিক।

তুমি আমার ঘুম ভাঙা ভোর বাউল 'রাই জাগো' গান

তুমি আমার খয়রাতী দান রেশন চালের পাথরকুচি

দূর-বিদেশে তুমি আমার খাল পেরোতে ভাঙা সাঁকো

তুমি আমার ঘুষঘুষে জ্বর নতুন জুতোর দুঃখ ও সুখ

ওপর— আলার খুশি মেজাজ তুমি আমার তুমি আমার

ইদানীংকালে নীরব কবি কাউকে বলা যায় তো তিনি তপন মহন্ত। কবিতার বই 'অন্ধকারে পৌর্ণমাসী'[৯৫] এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সময় অস্থিময়'[৯৬]। এই সময়ে গোটা বিশ্ব জুড়েই সন্ত্রাস এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। অসম তথা উত্তর-পূর্বে তো সন্ত্রাসের আশঙ্খা আরও তীব্র। পথে নামলেই মনে হয়, এই বুঝি বিস্ফোরণে উড়ে গেলাম। রাতে বাড়ি ফেরার পথে খুন হয়ে যেতে পারি। বিমানে উঠলে হাইজ্যাকের আশঙ্কা। তপন নিজের মতো করে লিখেছেন—

আজকাল পথে নামলেই টের পাই

অহেতুক ধুকপুক গভীরে

বাসে বাসে চুপচাপ ভাবি বিস্ফোরণ

সহযাত্রীকে আড়চোখে চলন্ত ট্রেনের কামরায়

বিমানে হাইজ্যাক মাছিটা ভন্ ভন্ করেই

ফুটপাতে চকচকে ইস্পাতের ফলা

নোলার মতো জিভটা বাড়িয়েই থাকে

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিস্ফোরণ-নাশকতা প্রায় জলভাতের সমান হয়ে গেছে। অন্তত তপনের কবিতা তাই বলছে—

ক্যামেরার মুখোমুখি বলে

উনি, বললেন,

দুর্ঘটনার কারণ এখনও অজ্ঞাত

নাশকতা হতে পারে নাও হতে পারে

তদন্ত চলছে...

পত্রিকা অফিসে

খবর পাঠাল সাংবাদিক

গতবারের রিপোর্টটাই ছাপতে ছিল

অবশ্যই স্থান কাল পাল্টে।

দেশকাল সমাজ সচেতন কবি অনুরূপা বিশ্বাস এক লড়াকু। আশির দশক— বরাকের কাব্যচর্চায় নূতন করে জোয়ার আছে। এই লড়াকু প্রতিবাদী কবির চিত্তে অসমের বিদ্বেষ হিংসার বিষকল্প দারুণ আঘাত হানে। কবি লিখলেন—

আমার স্বদেশ নেই মানচিত্র হতে মুছে গেছে

কবির স্বদেশ বাঁচে মনের ভূগোলে

মানুষের প্রেমপ্রীতি মৈত্রী গড়ে

ইতিহাস ইমারত আজ ভেঙে গেছে

ধুলায় মিশেছে সব—সব গর্ব সাধ অহংকার

মানুষী সভ্যতা কাঁদে আসামের শ্যামল প্রান্তরে...

আশির দশকে গুয়াহাটিতে উদয়ন বিশ্বাস প্রকাশ করলেন 'একা এবং কয়েকজন'। ওই ছোটো পত্রিকায় কয়েকজন কবিকে দেখা যায়। গৌতম মিত্র, তপন রায়, সুব্রত চৌধুরী, সঞ্জয় চক্রবর্তীরা সেই সময় কলম হাতে উঠে এলেন। উদয়নের[৯৭] 'একা এবং কয়েকজন' যে বলিষ্ঠ লিটল ম্যাগ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখিয়েছিল তার অনুপ্রেরণায় গুয়াহাটিতে দুরন্ত কিছু ছোটো পত্রিকা (আধুনালুপ্ত) প্রকাশিত হয়। গৌতম মিত্র[৯৮]-রতন ভট্টাচার্য[৯৯] সম্পাদনা করতেন 'নীল পাহাড় লাল নদী'[১০০], সঞ্জয়[১০১] ও অভিজিৎ লাহিড়ি[১০২] নিয়ে এলেন 'মহাবাহু', সুব্রত চৌধুরীর[১০৩] ছিল 'পত্রপুট'[১০৪], দিলীপ দাসের 'মাজুলি'[১০৫]। আশির শেষ এবং নব্বইয়ের প্রথমার্ধে গুয়াহাটির যে কোনও ছোটো পত্রিকা খুললেই সঞ্জয়-তপন-গৌতম-সুব্রতদের দেখা মিলবেই।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীকে দশক ওয়ারি বিশ্লেষণে নব্বইয়ে রাখতে হবে। সঞ্জয়ের একমাত্র কবিতাবই, তরঙ্গতাড়িত, প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। গ্রন্থিত কবিতাপর্ব ছিল ১৯৯২-১৯৯৬। সঞ্জয় সম্পাদনা করতেন 'মহাবাহু' পত্রিকা। লিটল ম্যাগাজিনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে যা অচিরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি মহাবাহু ফের প্রকাশিত হয়েছে। সঞ্জয়দের সেখানে বিস্তৃত পাওয়া যাবে আশা রইল। সঞ্জয় এবং তপন রায় আঙ্গিকে কবিতা নির্মাণ করেছিলেন ব্রহ্মপুত্র পারে তা অনাস্বাদিত ছিল। সঞ্জয়ের কবিতায় সবসময় কোনও না কোনও বার্তা থাকে, নিদেনপক্ষে বিবরণ। অসমিয়া-বাঙালি সম্পর্ক নিয়ে যাঁরা লেখালিখি করছেন বা করেছেন সঞ্জয় ওই তালিকায় উপরের দিকে থাকবেন। এবং সঞ্জয় হচ্ছেন বর্হিবিশ্বের কাছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি মুখ।

ডবকার মেয়েটি কি জানে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা?

সে শুধু এক্কাদোক্কা খেলে আর বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে পাঠশালায়।

এখানে তথ্য হিসেবে যোগ করা যেতে পারে, ডবকা অসমের একটি স্থানের নাম। মেয়েটির আগে ডবকা

বসে দুটি অর্থ তৈরি করেছে। ডবকার মেয়েটি নাকি ডবকা মেয়েটি? নারীশিক্ষার জন্য স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র। এক্কাদোক্কা খেলা মেয়েটির তাঁর নাম জানার দায় নেই। সে শুধু 'দুয়েক পলক/বৃষ্টিভেজা/বাংলাভাষা' কে বাঁচিয়ে রাখতে যায় বাংলা মাধ্যমের পাঠশালায় গিয়ে।

ব্রহ্মপুত্র পারে অসমিয়া—বাঙালি সহাবস্থান। সঞ্জয় সঠিক ভাবেই লিখছেন—

যাদের সঙ্গে আমার দিবস রজনী

তারা জানে না রবীন্দ্র সংগীত।

যেমন আমার ঘরে এখনও বাজেনি

জুবিনের কোনও গীত।

গোটা দিন কেটে যায় অন্যভাষী মানুষের সঙ্গে! রবীন্দ্রনাথকে জানার তাঁদের কোনও দায় নেই। আর বাঙালি কবির ঘরেও বাজেনি অধুনাবিখ্যাত অসমিয়া গায়ক জুবিন গার্গের কোনও গান।

লুইতপারের অসমিয়া বাঙালিদের সহবাসের কথা সঞ্জয় কখনও বিস্মৃত হন না। তাঁর 'একই বাতাস' কবিতায় এই বার্তা বড়ো নির্দিষ্ট —

আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতীপ্রসাদের গীত

তুমিও তেমনি, হঠাৎ কখনও, শুনে নিও রবীন্দ্রসংগীত।

সঞ্জয়ের 'শোণিতপুরে রক্তকরবী' ও 'বাবা' প্রায় লোককথায় পরিণত হয়েছে। শক্তিমান এই কবি মৃদুছন্দে অন্ত্যমিলে লিখেছেন 'বাবা'।

এই কবিতা এতই তীব্র অথচ সরল যে আলোচনার তোয়াক্কা করে না। আশির দশকে এমন একটা সময় গেছে প্রকাশ্যে বাংলা বলতে ভয় পেতেন বাঙালিরা। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে লুইতপারের বাঙালির অন্তর্বেদনাকে সঞ্জয় ধরেছেন অমর 'আমি একা নির্জন ঘরে' কবিতায়।

গঙ্গাপারের ছেলে মনের আনন্দে, খুল্লমখুল্লা, শোনে রবীন্দ্র দ্বিজেন-অতুল—নজরুল। আতঙ্ক-ত্রাসের লুইতপারে কোনও বাঙালির ঘরে উপর্যুক্ত গান বাজলে ধরে নিতে হবে ভুল হয়েছে— 'আমার ঘরেও চুপে বাজেন, যখন করি ভুল'।

গঙ্গাপারের ছেলের মতো লুইতপারের ছেলেও বাংলায় খায়, বাংলায় শোয়, বাংলায় কাঁদে, বাংলায় হাসে। 'স্বপ্ন দেখা— সেও বাংলায়, বাংলায় ভালোবাসাবাসি'। তবে তফাত কোথায়? 'তফাত শুধু এইটুকু/তুমি বুক ফুলিয়ে পাড়ায় পাড়ায়, ট্রামে বাসের ভিড়ে/আমি একা, নির্জন বিষণ্ণ এক ঘরে'।

মাতৃভাষায় কথা বলতে, গান শুনতে না —পারার যন্ত্রণার এই অভিব্যক্তি শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, বরাক উপত্যকা বা বাংলা দেশের কোনও কবির কলমে ফোটা অসম্ভব।

কবি ছবি গুপ্তা বরাক বধূ, শিলং কন্যা। কবিতা তাঁর বিজন দর্পনে প্রতিভাত আলোক সামান্যা, শব্দবিভায় গড়ে ওঠে আশ্চর্য আরোগ্য নিকেতন—

স্থানিকতা— বরাকের নায়রী হবে বোরো চালের মোটাভাত

ছোট পুকুরের জিয়ল মাছের ঝোল

কুমড়ো ভাঁটার চচড়ি

হাতের রোয়া শীতল পার্টি আন্তরিক সহবাস।

(সহবাস, শব্দ বিভাবতী)

এই ভুবনে আনতে গিয়ে কোকিল ডাকার বন

রাতকে নিলাম মুঠোয় ভরে দিনকে ধরে রন

('এই ভুবন', বিজন দর্পণ)

'ঈশানকোন ডট্ কম্' নামক এই কবিতার সঞ্জয় আরও একটা প্রশ্ন খুব নরম করে রেখেছেন—

তোমাদের শুধুই একুশ, উনিশ কি নয়?

সঞ্জয় চক্রবর্তী 'সাকিন' কবিতাতে ব্রহ্মপুত্রের সমস্ত বাঙালির মনের কথা বলে দিয়েছেন মাত্র ১৬ লাইনে।

এপার বাংলা ওপার বাংলার মাঝে

এক অপার বাংলা আছে।

.....

আমি সেই বাংলায় থাকি,

যেখানে, একুশ তত আত্মীয় নয়,

.....

গঙ্গাতীরে দিচ্ছে পাড়ি ওদের বাড়ি?

এদের সঙ্গে আমার আড়ি।

.....

তাহলে সুড়ঙ্গই ভালো, ভালো সহাবস্থান

এক হাতে বর্ণপরিচয়, অন্য হাতে তাম্বুলপান ;

যখন একা, ভীষণ একা,

হাতে শুধু গীতবিতান।

অন্যদিকে আবার বরাকের অন্যতম শক্তিমান কবি অমিতাব দেব চৌধুরী বরাকভ্যালি এক্সপ্রেস কবিতায় স্থানিকতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন কবিতার নামের মধ্যে দিয়ে মাত্র ষোলো লাইনেই—

যে ট্রেন যায়নি কোনোদিন, আমি তার যাত্রী ছিলাম। বিদায় চুম্বনগুলি, দেশের ভিটের বাস্তুসাপটির মতো কিংবদন্তি জন্ম ফিরে পেল।

আমার সকল যাওয়া সেই না যাওয়ার ভারে

আজীবন ফেরা হয়ে ওঠে।

আমাদের সব থাকা সেই না-যাওয়ার ভারে

সড়কের পাশে, সস্তা হোটেল খোঁজে

পরিত্রাণ, মূল স্রোত, ললাট লিখন।

যাওয়া না যাওয়ার মাঝখানে,

একটি অচল সেতু কারাগার হয়ে ওঠে ক্রমে।

যে ট্রেন যাবে না কোনোদিন, আমরা তার যাত্রী ছিলাম। গুয়াহাটিতে যেসব কবি বিস্ময়করভাবে অনালোচিত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত যদি সেই তালিকার ঊর্ধ্বে থাকেন তবে সুব্রত চৌধুরীর স্থান হবে দ্বিতীয়। অথচ নব্বইয়ের প্রথমদিকেই তিনি সম্পাদনা করেছেন কবিতা বিষয়ক ছোটো কাগজ— পত্রপুট। এরপর ১৯৯৭ সালে তাঁর কবিতার বই, শব্দেরা সমবেত কবিতা, বেরিয়ে গেছে। এমনকি ব্রহ্মপুত্রপারের প্রায় সমস্ত পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছেন সুব্রত। সম্ভবত কোনও গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকেননি বলেই কবিসমাজেও ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন সুব্রত। অসম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের আকাশ— মাটি-গাছ- মানুষ-নদী-ফুলের কথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে সুব্রতর কবিতায়।

এবার শীত জাঁকিয়ে পড়েছে

জাটিংগা পাহাড়ে, কমলালেবু ভোর।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই মুহূর্তে খুব বেশি নারী কবিতা লিখেছেন না। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে শিপ্রা দাস এখন আর তত সৃষ্টিশীল নন। মহিলা কবি একটা লঘু তকমা, তবু বলতে যদি হয়, দীপিকা বিশ্বাসই সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। এবং জয়িতা দাশ পুরকায়স্থের কথাও উল্লেখ্য তিনি সম্পাদনা করেন 'জললিপি' কবিতাপত্র। কয়েকটি ভালো কবিতা লিখে একেবারে থেমে গেছেন সম্ভাবনাময়ী জাহ্নবী দাশ। এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরীর কথা। তবে দীপিকা বিশ্বাস যথার্থ অর্থেই ব্রহ্মপুত্রের নারী কবি হিসেবে যথেষ্ট সৃষ্টিশীল। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'আমাকে এভাবে ভাবো' ও 'আমি কোনদিন বিধবা হব না'- সত্যিই কাব্যরসে ভরপুর। দীপিকা যে লুইত পারের কবি তা অবশ্যই তিনি ভুলে যাননি। প্রেম বা নারীসত্তা ছাড়াও স্থানিকতাকে এড়িয়ে যাননি দীপিকা।

নাইন্‌থ কলামের উদ্যোগে প্রকাশিত 'উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতার সংকলনে 'নিঃসঙ্গতা' নামে কবিতায় দীপিকা লেখেন, সন্ধেবেলা ব্রহ্মপুত্রের চরে হাঁটতে আমার খুব ইচ্ছে করে কিন্তু কখনো হাঁটা হয়নি, কেননা আমার কোনো প্রেমিক নেই, অন্য কারও সাথে হাঁটতে আমার ভালো লাগবে না।

কবিতাটি আদ্যন্ত প্রেমহীন এক প্রেমিকার কথা। কিন্তু প্রেমিকের হাত ধরে ব্রহ্মপুত্রের চরে হাঁটতে চাওয়ার ইচ্ছেটাই প্রবল করে দেয় কবির স্থানিকতার মানসকে।

আবার অন্যদিকে অসমের অন্যতম এই প্রজন্মের বিখ্যাত কবি প্রণব বর্মন[১০৬] তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পাগলী বৃষ্টি পড়ছে দেখো দেখো'[১০৭]-তে কটন কলেজ নামের একটি কবিতা লিখেছেন। কটন কলেজ নামটি শোনা

মাত্রই বোঝা যায় যে এটি অসমের গুয়াহাটির সেই বিখ্যাত কলেজ। যেখানে থেকে প্রচুর মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা পাশ করে বেড়িয়েছে এমন কি এখনতো কটন কলেজকে Centre of Execllence বলা হচ্ছে। সেই কটন কলেজে পড়াকালীন কবির যে অভিজ্ঞতা তারই অনুদিত অংশ এরকম

তোর বুকের তাম্রবর্ণের দৃশ্যৎমান দেওয়ালে কে কেটেছিল

সূর্যমুখী অজস্র খিড়কির নকশা

বোধিবৃক্ষের ছায়া বিছিয়ে উড়ে যায় রঙা স্বপ্নালু একঝাঁক পাখি

আমিও ছিলাম তেমনি একটা ফিনিক্স

.....

একদিন মানিকলাল হেনরি কটনের কাঁধে হাত রেখে বাণীকান্ত[১০৮], নবকান্ত[১০৯]— তুই যে কি না লেখা ইতিহাস ইতিহাসের ওমলাগা গন্ধ, সময়ের সুদৃশ্য জাদুঘর তুই যে কীভাবে প্ররোচিত করিস উদ্‌যাপন করতে জীবনের উৎসব

আর লেখা আত্মধ্বংসের বর্ণমালা

কটন কলেজ, কটন কলেজ

তোর সঙ্গে থাকতে পারে আমার কি বিদ্বেষ

তোর স্বপ্নের উদ্যানে আমি কুন্দেরা, শাহরুখ, লিয়েন্ডার পেজ!

(পাগলী বৃষ্টি পড়ছে দেখো দেখো, পৃ. ৩২)

লুইতপারের সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে অন্যতম শক্তিমান নিখিল তালুকদার[১১০] ইদানীং কবিতা খুব কম লিখছেন। তাঁর জীবনযাপনে কবিতা আর তেমন ধরা দিচ্ছে না। দিল্লীবাসী হয়ে যাওয়ায় কল্লোল প্রায় থেমে গেচ্ছেন, জীবিকার তাড়নায় নিখিলকে যেতে হয়েছে বরাক উপত্যকায়। এবং সবাক নিখিলকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। ৪ বছর আগে, ২০১২, নিখিলের একমাত্র কবিতাবই 'আয় বৃষ্টি জোট বাঁধি'। নামেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে নতুন ভাবনা নিয়ে আবির্ভাব ঘটছে কোনও কবির। কে আর বৃষ্টিকে জোট বাঁধার আহ্বান করেছে।

নিখিলের কবিতায় বিভিন্নভাবে স্থানিক প্রভাব পড়েছে। এবং এই উপত্যকার বাইরে থেকে অসমে বসবাস নয়, নিখিল বরাবর ব্রহ্মপুত্রপারের বাসিন্দা। এজন্যই লেখেন—

ঠিকানা আমার একটাই

মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র।

লিখে নাও

যদি সময় পাও, এসো।

পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে অনেকের মুখেই শুনতে হয়, ওখানে থাকা যায়? গোলমাল হচ্ছে না তো? এই

অনুভূতি নিখিলকেও ছুঁয়ে গেছে—

'ওখানে ভালো থাকা যায়?' জানতে চেয়েছ অনেকেই।

শুধু অসমিয়া বাঙালি নন, বোড়ো, ডিমাসা, কার্বি, মণিপুরি, নেপালি, বিহারি পাশাপাশি রয়েছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, কখনও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোকরাঝাড়, কখনও অশান্ত হয় কার্বি আংলং, কখনও দাঙ্গা হয় নগাঁও-বরপেটায় ; কিন্তু আমাদের গভীরতা সেসব স্মৃতিকে অতলে তলিয়ে নিয়ে যায়, পরস্পর আমরা ফের বন্ধু হয়ে উঠি। এখানে 'পরস্পর' শব্দটি অনন্য অভিঘাত এনে দিয়েছে। মহাকবির সেই রচনা '...এক দেহে হল লীন'— এর মতো আমরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গলাগলি করি, অমলিন সোহাগ করি। আর নিখিল এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পর্কে প্রশ্নকারী, সন্দেহ প্রকাশকারী বাঙালিকে জানান এসে দেখে যেও। আমাদের গলাগলি সহিষ্ণু অবগাহন।

ক্রিকেটের ভাষায় বলতে গেলে— অভিজিৎ চক্রবর্তী চুটিয়ে খেলেছেন ২০০০-২০০৮। একদা 'নাইন্‌থ কলাম। পত্রিকার সম্পাদক অভিজিৎ চক্রবর্তী এখনও অপরাজিত। তাঁর সম্পাদিত কাগজ 'কবিতার পূর্বোত্তর'[১১২]।

তাঁর একমাত্র কবিতা— বই 'অভিজিৎ চক্রবর্তীর কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে ছয় বছর আগে।

ইদানীং তিনি অসম্ভব তীক্ষ্ণ হয়েছেন। কলম হয়েছে আরও শাণিত। তুলে আনছেন উপজাতে অধ্যুষিত গ্রাম-অসমের কথকথা।

এছবি বুঝি শেষ চৈত্রে আঁকা?

কী ঝড় উঠেছিল মনে? বরদৈচিলা?

'সাংসুমা বসুমতারির চিত্রকর্ম' কবিতা এভাবেই শুরু করেছেন কবি! বসুমতারি পদবী থাকলেই বুঝে নেওয়া যায় যে এই ব্যক্তি কেড়ো উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এবং বোড়োদের মধ্যে সাংসুমা অত্যন্ত পরিচিত নাম। কয়েক বছর আগে প্রায় প্রতিদিনই প্রথম পাতায় থাকত অশান্ত বোড়োল্যান্ডের গল্প।

...সমাগত বৈশাগুর দিনে

দয়িত দূরে ছিল বুঝি?— অতি দূর, রাষ্ট্র ছড়িয়ে

বোড়োদের এক উৎসবের নাম বৈশাগু। অশান্ত বোড়ো ভূমিতে অনেকেই থাকতে পারেননি, রাষ্ট্র ছাড়িয়ে চলে যেতে হয়েছে অনন্ত শয়নে।

দখনায় সবুজের বাড়াবাড়ি ভিড়

একরাশ পলুদের অনর্গল খিদে

তাঁতশালে সাংসুমা একা একা

কী স্বপ্ন বুনেছিলে তুমি?

বোড়ো জনজাতির মেয়েরা দখনা পরিধান করে। এবং সেটা এখনও নিজেদের ঘরেই তৈরি হয়। এখানে দয়িত চলে গেছে রাষ্ট্র থেকে দূরে। তাঁতশালে সাংসুমা বসুমতারি একা একা স্বপ্ন বুনে যায়।

নারীহারা, দয়িতহরা প্রেমিক। তাঁর কান্না, তাঁর অভিমান, তাঁর অনুরাগ ঝরে পড়ে এরন্তার পাতায়। এবং কবির অনিবার্য প্রশ্ন—

কত অশ্রু সবুজে মেশালে

এমন হরিদ্রাভ হয় এরন্ডার পাতা?

— এইভাবেই ব্রহ্মপুত্র পারের কবিতায় স্থানিকতা এক বিশাল স্থান নিয়ে বিরাজ করেছে ও করছে। শুরু করেছিলেন অমলেন্দু, বীরেন্দ্রনাথেরা। সেই মশাল এখনও জ্বলন্ত এবং হলফ করে বলা যায় কখনও নিভবে না।

তথ্যসূত্র

১. হেমাঙ্গ বিশ্বাস — বিখ্যাত গণসংগীত শিল্পী। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সীমান্তের প্রহরী'।
২. অমলেন্দু গুহ — কবি, গবেষক। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'লুইত পারের গাথা'।
৩. অমিতাভ দেব চৌধুরী— বরাকের অন্যতম প্রধান কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্নসুমারি'।
৪. বিকাশ সরকার— উত্তরবঙ্গে জন্মালেও কবিতাচর্চা করেছেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'কণিষ্কের মাথা ও অন্যান্য'।
৫. শক্তিপদ ব্রহ্মচারী— বরাক উপত্যকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'অনন্ত ভাসানে'।
৬. ঊর্ধ্বেন্দু দাশ— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম প্রধান কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'আয়ত উত্থান'।
৭. কিশোর ভট্টাচার্য — কবি, অসমিয়া ভাষায় মূলত লেখালিখি করেন।
৮. দিলীপ কান্তি লস্কর — বরাক উপত্যকার কবি। 'লালনমঞ্চ' লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক।
৯. সঞ্জয় চক্রবর্তী— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'কুয়াশালিপি', 'মায়া পাহাড়'।
১০. গোপীনাথ বরদলৈ— রাজনীতিক, অসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।
১১. বিষ্ণুরাম মেধি— রাজনীতিক, অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।
১২. ডা. হৃদয়নাথ কুঞ্জরু — সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ।
১৩. মনীশ ঘটক — সাহিত্যিক, 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে লিখতেন।
১৪. বনফুল — সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম।
১৫. দক্ষিণারঞ্জন বসু — সাহিত্যিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ছেড়ে আসা গ্রাম'।
১৬. অমিতাভ চৌধুরী— বাংলা ভাষার প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক।
১৭. করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য — বরাক উপত্যকার কবি।
১৮. অনুরূপা বিশ্বাস— বরাক উপত্যকার কবি।
১৯. অশোক বার্মা — বরাক উপত্যকার ঔপন্যাসিক।
২০. বিপ্ররাজ দাস — ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২১. সুবীর কর — প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ৰৰ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২২. সনৎকুমার কৈরী — শিক্ষাবিদ। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ৰৰ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২৩. পরিতোষ পাল — ভাষাসংগ্রামী। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ৰৰ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২৪. কানু আইচ — প্রাবন্ধিক। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২৫. ইমাদ উদ্দিন বুলবুল — ঔপন্যাসিক। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় পুলিশের গুলিতে মৃত ১১ জন ভাষাশহিদকে নিয়ে বই লিখেছেন।
২৬. জন্মজিৎ রায় — বরাক উপত্যকার কবি।

২৭. ছবি গুপ্তা — বরাক উপত্যকার কবি।
২৮. দেবাশিস ভট্টাচার্য— কবি, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাসিন্দা।
২৯. কিশোর ভট্টাচার্য — কবি, মূলত অসমিয়া ভাষায় লেখালিখি করেন।
৩০. ঊর্ধ্বেন্দু দাস — ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম প্রধান কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'আয়ত উত্থান'।
৩১. ভূপেন হাজরিকা — অসমের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক।

৩১. তপোধীর ভট্টাচার্য— কবি, প্রাবন্ধিক, আলোচক, শিক্ষাবিদ। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণ গোধূলি'।
৩২. কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য— লোকসংগীত গবেষক-শিল্পী। কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন।
৩৩. বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য— বরাক উপত্যকার অন্যতম কবি। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক।
৩৪. সুধীর সেন— বরাক উপত্যকার অনালোচিত কবি।
৩৫. দিলীপ ফুকন— অসমিয়া কবি।
৩৬. রফিকুল হুসেন— অসমিয়া কবি।
৩৭. আমাকে এভাবে ভাবো— দীপিকা বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ।
৩৮. দীপিকা বিশ্বাস— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার খ্যাতিময়ী কবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আমাকে এভাবে ভাবো'।
৩৯. তরঙ্গতাড়িত — ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
৪০. মহাবাহু — সঞ্জয় চক্রবর্তী ও অভিজিৎ লাহিড়ী সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন।
৪১. সঞ্জয় উদাস — সঞ্জয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ।
৪২. শিপ্রা দাস— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মহিলা কবি, যাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে— নস্টালজিয়া।
৪৩. জয়িতা দাশ পুরস্কায়স্থ — ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি।
৪৪. জললিপি— জয়িতা দাশ পুরকায়স্থ সম্পাদিত কবিতাপত্র।
৪৫. কুয়াশালিপি— সঞ্জয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ।
৪৬. অমিতাভ দেব চৌধুরী — বরাক উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'স্বপ্নসুমারি'।
৪৭. জুবিন গার্গ— বিখ্যাত গায়ক। অসমিয়া, বাংলা, হিন্দি সহ বিভিন্ন ভাষায় গান গেয়েছেন।
৪৮. জাহ্নবী দাশ— কবি, 'মে'খানা' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।
৪৯. মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী— 'ময়ূখ' পত্রিকার সম্পাদক।
৫০. পূর্বদেশ গল্পপত্র— অখিল দত্ত সম্পাদিত গল্পের পত্রিকা। অখিল দত্তের প্রয়াণের পর সম্পাদনা করেন রাধা দত্ত।
৫১. আমাকে এভাবে ভাবো— দীপিকা বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ।
৫২. জীবন যার নাম— দীপিকা বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ।
৫৩. আমি কোনো দিন বিধবা হব না— দীপিকা বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ।
৫৪. স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য— বরাক উপত্যকার কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'অ-কবিতা'।
৫৫. রবীন্দ্রনাথ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এশিয়ার একমাত্র নোবেলজয়ী কবি।
৫৬. অতন্দ্র— বরাক উপত্যকার লিটল ম্যাগাজিন। অধুনালুপ্ত। একে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকায় শক্তিশালী কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।
৫৭. অর্জুন দাস — ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তরুণ কবি ও গল্পকার।

৫৮. মানিক দাস— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শক্তিশালী গল্পকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক।
৫৯. লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়া — অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্যিক।
৬০. সাহিত্যরথী — লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে 'সাহিত্যরথী' উপাধি দিয়েছেন সাহিত্যপ্রেমীরা।
৬১. অশোকবিজয় রাহা — বরাক উপত্যকার কবি।
৬২. সৌমেন ঠাকুর— বামপন্থী কবি।
৬৩. রাম বসু— বিখ্যাত বামপন্থী কবি। ৰজ্মপ্ত সালে অমলেন্দু গুহর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁকে একটি কবিতা উৎসর্গ করেছেন অমলেন্দু গুহ।
৬৪. অরণি— লিটল ম্যাগাজিন।
৬৫. পরিচয়— দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন।
৬৬. লুইত পারের গাথা— অমলেন্দু গুহর একমাত্র বাংলা কাব্যগ্রন্থ।
৬৭. পরবাসী— বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
৬৮. নাইন্থ কলাম— প্রসূন বর্মন সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন।
৬৯. বিষণ্ণ পরবাস, নির্বাসন নয়— ঊর্ধ্বেন্দু দাসের কাব্যগ্রন্থ।
৭০. ঘরে তার ফেরা বা না-ফেরা— ঊর্ধ্বেন্দু দাসের কাব্যগ্রন্থ।
৭১. এই লজ্জা তোমার আমার— ঊর্ধ্বেন্দু দাসের কাব্যগ্রন্থ।
৭২. জীবনানন্দ— জীবনানন্দ দাশ, বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা'।
৭৩. ক্ষিতীশ রায়— কবি, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক। সম্পাদনা করতেন 'সংবর্ত' পত্রিকা।
৭৪. অসিত দত্ত — কবি। ছয়-সাতের দশকে অনেক কবিতা লিখেছেন।
৭৫. দ্বৈত — ডিব্রুগড় থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন। অধুনালুপ্ত।
৭৬. সংবর্ত — ক্ষিতীশ রায় সম্পাদিত ডিব্রুগড় থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন। অধুনালুপ্ত।
৭৭. সাংস্কৃতিকী— ডিব্রুগড় থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন। অধুনালুপ্ত।
৭৮. জীবন নাথ— কবি, অধ্যাপক। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'পুষ্পমোচনের উদ্ভিন্ন রাগে'।
৭৯. শাশ্বতী সমা— জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থ।
৮০. 'মা নিষাদ'— জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থ।
৮১. পুষ্পমোচনের উদ্ভিন রাগে— জীবন নাথের কাব্যগ্রন্থ।
৮২. ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা— জীবন নাথ সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন।
৮৩. রমানাথ ভট্টাচার্য— কবি, অনুবাদক। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'লৌকিক বৃত্তের ভিতর'।
৮৪. পৃথিবী— রমানাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন। অধুনালুপ্ত।
৮৫. লুইতের পদাবলী— রমানাথ ভট্টাচার্য অনূদিত বাংলা ভাষায় অসমিয়া কবিতার সংকলন।
৮৬. সত্যেন চৌধুরী— কবি-অধ্যাপক, উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সাঁকো'।
৮৭. সাঁকো— সত্যেন চৌধুরী ও দুর্গা হাজরিকার দ্বিভাষিক কাব্যগ্রন্থ।
৮৮. প্রমোদরঞ্জন সাহা— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'হলুদ পাতার মতো'।
৮৯. স্বরের আড়ালে শ্রুতি— রমানাথ ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ।
৯০. উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা— কবিতা সংকলন, সম্পাদক প্রবুদ্ধসুন্দর কর, প্রসূন বর্মন ও

অমিতাভ দেব চৌধুরী।

৯১ . একা এবং কয়েকজন— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মর্যাদাসম্পন্ন লিটল ম্যাগাজিন। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক উদয়ন বিশ্বাস।

৯২. মহাবাহু— সঞ্জয় চক্রবর্তী ও অভিজিৎ লাহিড়ী সম্পাদিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লিটল ম্যাগাজিন।

৯৩. মাজুলি— দিলীপ দাস সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন।

৯৪. পেঁপা— মহিষের শিং দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ করে রঙালি বিহুর সময় বাজানো হয়।

৯৫. অন্ধকারে পৌর্ণমাসী— তপন মহন্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

৯৬. সময় অস্থিময়— তপন মহন্তের কাব্যগ্রন্থ।

৯৭. উদয়ন— উদয়ন বিশ্বাস, একা এবং কয়েকজন লিটল ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

৯৮. গৌতম মিত্র— কবি, জীবনানন্দ গবেষক। সম্পাদনা করেছেন 'নীল পাহাড় লাল নদী' লিটল ম্যাগাজিন।

৯৯. রতন ভট্টাচার্য— কবি। খুব কম কবিতা লিখেছেন। অধুনালুপ্ত 'নীল পাহাড় লাল নদী' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

১০০. নীল পাহাড় লাল নদী— লিটল ম্যাগাজিন। মূলত কবিতা প্রকাশিত হত। সম্পাদকদ্বয় গৌতম মিত্র ও রতন ভট্টাচার্য।

১০১. সঞ্জয় চক্রবর্তী— কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সঞ্জয় উদাস'।

১০২. অভিজিৎ লাহিড়ী— কবি, গল্পকার। মহাবাহু পত্রিকার সম্পাদক।

১০৩. সুব্রত চৌধুরী— কবি, পত্রপুট কবিতার সম্পাদক।

১০৪. পত্রপুট— অধুনালুপ্ত, সুব্রত চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত আটের দশকে।

১০৫. মাজুলি— লিটল ম্যাগাজিন। মূলত কবিতা প্রকাশিত হত। অধুনালুপ্ত। সম্পাদনা করতেন দিলীপ দাস।

১০৬. প্রণব বর্মন— অসমিয়া তরুণ কবি।

১০৭. পাগলী বৃষ্টি পড়ছে দেখো দেখো— সুদীপা ভট্টাচার্যের অনুবাদে প্রণব বর্মনের কাব্যগ্রন্থ।

১০৮. বাণীকান্ত — বাণীকান্ত কাকতি, বিখ্যাত অসমিয়া শিক্ষাবিদ।

১০৯. নবকান্ত — নবকান্ত বরুয়া, বিখ্যাত অসমিয়া কবি।

১১০. নিখিল তালুকদার — ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'নদী হও বনানি'।

১১১. আয় বৃষ্টি জোট বাঁধি— নিখিল তালুকদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

১১২. কবিতার পূর্বোত্তর — অভিজিৎ চক্রবর্তী সম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিন, অধুনালুপ্ত।